বঙ্গ
কমলবার্তা
অক্টোবর সংখ্যা। ২০২৩। মূল্য ২৫ টাকা

ভারতে জি২০
খালিস্তানি আন্দোলন
সংবিধানের প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে

ঘোটকের মুখোমুখি খেলামেলার সরকার

এশিয়াডে একশো

ভারতে নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম

নোয়াখালিতে হিন্দু বাঙ্গালী গণহত্যা

উত্তর কলকাতায় সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার দুর্গাপূজার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ সহ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।
এই পুজোয় এবছরের থিম ‘রাম মন্দির’।

বঙ্গ
কমলবার্তা

অক্টোবর সংখ্যা। ২০২৩

ঘোটকের মুখোমুখি খেলামেলার সরকার ৪
অশোক কুমার লাহিড়ী

১৯৪৬-এর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজাঃ বাঙ্গালীর এক আতঙ্কের দিন ৬
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতে নারী সংরক্ষণ আইন ৯
রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী

নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম -আবহমান কাল থেকেই ভারতে বিদ্যমান ১২
স্বাতী সেনাপতি

জি২০: ভারতের কিস্তিমাত ১৫
শিশির বাজোরিয়া

ছবিতে খবর ১৮

এইবার, সত্যিই একশো পার ২৪
অভিরূপ ঘোষ

খালিস্তানি আন্দোলন এক ঝলকে ২৭
সৌভিক দত্ত

সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সেক্যুলার' ও 'সোশ্যালিস্ট' শব্দবন্ধ— ইতিহাস ও রাজনীতি ৩০
আবীর রায় গাঙ্গুলি

ওরা ভয় পেয়েছে ৩২
জয়ন্ত গুহ

ফেক নিউজ ৩৪

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, উজ্জ্বল সান্যাল, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক পালাবদল পশ্চিমবঙ্গ আগেও দেখেছে। প্রতিবার পালাবদলের সময় শাসকদলের বাধ্য পুলিশ বিরোধী দলনেতা বা নেত্রীকে নানারকম ভাবে বিপদে ফেলে বা চেষ্টা করে। শাসকদলকে বিপদে ফেলছে বা ফেলতে পারে এমন সব খবরের কাগজ বা চ্যানেলের বিরুদ্ধে মুড়িমুড়কির মত মামলা হয় বা পুলিশ গিয়ে অযথা হয়রানি করে সাংবাদিকদের। গ্রামে বা ছোটো শহরে বিরোধী দলের সমর্থকদের ওপর অত্যাচার আরও তীব্র হয়। সবকিছুই কিন্তু ভয় দেখানোর জন্য। আর এই ভয় দেখানোর কারণ শাসক ভয় পায় বলে। ক্ষমতা হারানোর ভয়। এক তীব্র ভয়ের চোরাবালিতে শাসকের অহংকার যখন ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে থাকে তখনই শেষ শক্তি নিয়ে ভয়ংকর সেই ঝাপটা দেয় শাসক। নড়াচড়া করার শক্তি তখন নেই। হারিয়ে গেছে যুক্তি বোধ। একমাত্র পড়ে থাকে দুর্গন্ধময় পচা খিস্তি।

একসময় এই খিস্তি কংগ্রেসিদের ট্রেডমার্ক ছিল। তারপর ক্ষমতা থেকে যাওয়ার আগে এই খিস্তি শুনেছি আমরা কমঃ গৌতম দেব এবং বিনয় কোঙারের মুখে। সম্প্রতি তুমুল খিস্তি শুনলাম তৃণমূলের চার সাংসদ অধ্যাপক সৌগত রায়, কাকলি ঘোষদস্তিদার, মহুয়া মৈত্র এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে, অভিষেক বাবুর ধর্নামঞ্চে।নিরলস একটা চর্চা না থাকলে এমন অনায়াসে খিস্তি দেওয়া যায় কী? প্রায় প্রতিদিন সেই অনর্গল খিস্তির বন্যায় ভাসতে ভাসতে মনে হচ্ছিল এটা কি রাজনৈতিক ধর্নামঞ্চ নাকি খিস্তির ধর্নামঞ্চ! এসব গায়ে মাখতে নেই। শেষের সেদিন বড় ভয়ংকর। তখন কি বলছে না বলছে সেসব কি আর মাথায় থাকে! জনগণের স্বার্থে সাংবিধানিক ক্ষমতার ব্যবহার না করে, শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ গোছাতে ক্ষমতায় থাকা যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখন ক্ষমতা হারানোর ভয় ভূতের মত চেপে বসে। এ তো আর ছাগল হারানোর কেস নয়!

তবে এই পরিণতি একদিনে হয় না। দিনের পর দিন অন্ধ অহংকারে শাসক যখন সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা ভুলে যায়, এমনকি গ্রামের দরিদ্র মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে এমনই নয়ছয় করে যে সেই প্রকল্পের খরচখরচা নিয়ে হিসেব পর্যন্ত দিতে পারে না কিন্তু ভোট টানতে পুজো উদ্যোক্তাদের ৭০০০০ টাকার অনুদান দিতে অস্থির হয়ে ওঠে তখন গোটা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পরে এক নিরাশা। খেলা-মেলা আর ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে শাসক এতটাই ব্যস্ত যে চুঁচুড়ার অগ্নিকন্যা, সোনার মেয়ে, ক্রিকেটার তিতাস সাধু যখন এশিয়ান গেমস থেকে কলকাতায় ফিরলেন তাঁকে সম্বর্ধনা দিতে কেউ গেল না! এ বাংলা আমার বাংলা নয়। বাংলাকে নিয়ে এই খামখেয়ালিপনা, অপমান, অত্যাচার, নৈরাজ্য ছত্রভঙ্গ হোক মা দুর্গার ঘোটক আগমনে। আমরা অপেক্ষায় থাকবো ১০৮ স্থল পদ্মে মা দুর্গার চরণ বন্দনায়।

জয় হিন্দ।

ঘোটকের মুখোমুখি খেলামেলার সরকার

অশোক কুমার লাহিড়ী

পঞ্জিকা মতে ঘোটকে এবার মায়ের আগমন ও গমন। মানে ছত্রভঙ্গের ইঙ্গিত। ধ্বংস ও অস্থিরতার বার্তা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কী ধ্বংস হতে পারে? খেলামেলার সরকারের কৈলাসপ্রমাণ অহংকার? পঞ্চায়েতের ১০০ দিনের কাজে বিপুল দুর্নীতি কি আরও অস্থিরতা তৈরি করবে রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিতে? নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অসুরদের চোর-পুলিশ খেলা কি অবশেষে ছত্রভঙ্গ হতে চলেছে?

শরৎকালে পাঁচ দিনের জন্য মা দুর্গা, কৈলাস থেকে মর্ত্যে বাপের বাড়ি আসেন আমাদের কাছে তাঁর দুই মেয়ে আর দুই ছেলেকে নিয়ে। আমরা দুর্গার পূজা করি এবং এই পাঁচ দিনকে বলি শারদোৎসব, দুর্গোৎসব, দুর্গাপুজো বা শুধু পুজো। সেই পুজোর জন্য আমরা সারাটা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি।

কৈলাস থেকে বাপের বাড়ি দূর অনেক। মা দুর্গা এবং তাঁর চার ছেলে-মেয়ে এতো দূরের পথ আসা-যাওয়ার জন্য নৌকা, গজ, দোলা বা ঘোটক ব্যবহার করেন এবং অনেকের মতে দেবীর যাতে আগমন এবং গমন, সেটি আমাদের মর্ত্যবাসীদের আগামী বছর কেমন কাটবে তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এবার এই আসা আর যাওয়া দুটিই হচ্ছে ঘোটকে অর্থাৎ ঘোড়ায়। এই ঘোটকে আসার অর্থ নাকি আগামী বারোমাসে ছত্রভঙ্গ অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা। এইসব কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন বা নাও করতে পারেন, কিন্তু সত্যি যদি আগামী বারো মাসে আরো বিশৃঙ্খলা হয় তার মানেটা কি হবে?

বলতে পারেন আরো বিশৃঙ্খলা হওয়ার বাকীটা কি আছে? সেটাও কি সম্ভব? এক তাবড় মন্ত্রীমশাই তাঁর সুন্দরী তরুণী বান্ধবীর সুসজ্জিত গৃহে অনেক কোটি টাকার সঙ্গে ধরা পড়ে জেলের হওয়া খাচ্ছেন। তাও যেমন তেমন মন্ত্রী নন, একেবারে নতুন প্রজন্মের ধর্তা-কর্তা-বিধাতা শিক্ষামন্ত্রী! শিক্ষকদের পদ নাকি বিক্রি হয়েছে! আপনি যদি বলেন যে এই বিক্রি খুব সুসংগঠিতভাবে হয়েছে এবং একে বিশৃঙ্খলা বলা অনুচিত, তাতে আপত্তি করার সুযোগ নেই। কিন্তু একথা তো বলাই যায় যে শিক্ষকদের চাকরি বিক্রি কোনো সভ্য সমাজের আইনকানুন এবং নৈতিকতার শৃঙ্খলাবিরুদ্ধ।

যাহোক এই শিক্ষকদের চাকরি বিক্রির কথা বাদই দিন, চলে আসুন শিক্ষাক্ষেত্রে লাইব্রেরির ব্যাপারে। কোনো সভ্য সমাজে লাইব্রেরি - যেখানে ছাত্ররা শুধু নন, অন্যান্য সাধারণ মানুষ বই, পত্র-পত্রিকা, এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ জার্নালস পড়তে পারেন - সেগুলির খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১,৫০০টি বেসরকারি (সরকারের পৃষ্টপোষকতা ছাড়া) লাইব্রেরিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাৎসরিক অনুদান দেন ২৫,০০০ টাকা। আপনারা জানেন বই এখন কত দামি হয়ে গেছে। এই সামান্য ২৫,০০০ টাকায় কটি বইই বা কেনা যায়? কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে সরকারের ভাঁড়ার শূন্য। টাকা নেই। টাকা দেবেন কোথা থেকে?

কিন্তু এরই সঙ্গে যদি দেখি তৃণমূলের সরকার দুর্গাপুজো

কমিটিগুলির জন্য কি অনুদান দিচ্ছেন সেটা একটু চমক লাগার মতো। এই সরকার ২০১৮ সালে ২৮,০০০ পুজো কমিটিকে ১০,০০০ টাকা করে দিতেন। সেই অনুদান বাড়িয়ে ২০১৯-এ ২৫,০০০ টাকা, ২০২০-তে ৫০,০০০ টাকা, ২০২২ সালে ৬০,০০০ টাকা এবং ২০২৩ সালে ৭০,০০০ টাকা করেন। তাছাড়াও দুর্গাপুজোর কমিটিগুলিকে তাদের ইলেকট্রিসিটি বিলের ওপর দুই-তৃতীয়াংশ ছাড় দিয়েছেন মাননীয়া মমতা ব্যানার্জির সরকার!

কোথায় ১,৫০০-টির মতো বেসরকারি লাইব্রেরির জন্য বাৎসরিক ২৫,০০০ টাকা, আর কোথায় প্রায় তার দ্বিগুণেরও বেশি প্রত্যেকটি দুর্গাপুজো কমিটির জন্য ৭০,০০০ টাকা এবং ইলেকট্রিক বিলে দুই-তৃতীয়াংশ ছাড়! ভোটসর্বস্ব রাজনীতিতে দুর্গাপুজোর কমিটিগুলির উপযোগিতা অবশ্যই লাইব্রেরিতে যারা পড়াশুনা করে সেই ছাত্রছাত্রীর তুলনায় অনেক বেশি। কেননা বেশিরভাগ সেই ছাত্রছাত্রীদের তো ভোট দেওয়ার বয়সই হয়নি! শাসকদল একথাও বলতে পারেন যে দুর্গোৎসবের জন্য পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি কত উজ্জীবিত হয়। সে কথা সত্য হলেও, দুর্গাপুজো কমিটিগুলির অনুদানের জন্য চপের বিক্রি কত বাড়লো তার থেকেও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কতটা শিক্ষিত এবং বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিপুণ হলো তার উপকারিতা অনেক বেশি। এই অবস্থায় দুর্মুখেরা যদি এই তৃণমূল সরকারকে খেলা-মেলার সরকার বলেন এবং এই খরচের নমুনাকে ফিসক্যাল বিশৃঙ্খলা বলেন, তাহলে আপত্তি করতে পারবেন কি?

ফিসক্যাল বিশৃঙ্খলা বেশিদিন চললে সেটা ফিসক্যাল ক্রাইসিস বা সংকটে পরিণত হয়। এই ভয়ংকর পরিণাম আমরা সম্প্রতি দেখেছি শ্রীলংকায় এবং পাকিস্তানে। সৌভাগ্যবশত ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় দেশের একটি প্রদেশে সেই পরিণতি হওয়া সম্ভব নয়। যেটা হয় সেটা কেন্দ্র সরকারের ফাঁকির অভিযোগের সম্বন্ধে তারস্বরে চিৎকার, যেটা আমরা বাম আমলেও দেখেছি। আর যেটা হয় সেটা প্রতিশ্রুতি এবং সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান। মনে পড়ে আমাদের কল্লোলিনী কলকাতাকে লন্ডন বানানোর প্রতিশ্রুতি? ভাঁড়ার শূন্য, সুতরাং শোনা যায় আমলাদেরকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর একের পর এক কঠোর নির্দেশ, এই করুন, সেই করুন। কিন্তু সেসব করার জন্য অর্থ কোথা থেকে আসবে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরবতা।

তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদে বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলের অবস্থান বিক্ষোভ।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের টাকা নিয়ে দুর্নীতির প্রতিবাদে ধর্মতলায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিজেপি মহিলা মোর্চার ধর্না কর্মসূচি।

যেমন ধরুন সরকারি পক্ষ থেকে ২০২২ সালে পুজোয় দিঘায় অতিরিক্ত বাস চালানো হবে বলে ঘোষণা হয়েছিল। তবে নতুন বাস কেনার জন্য অর্থ কোথায়? অর্থদপ্তরে আবেদন করা হয়েছিল। পরিবহণ দফতরের আধিকারিকের মুখে এ কথা ও কথা শুনে পূর্ব মেদিনীপুরের এক প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আপনাদের ভর্তুকি দেব। টাকা দেব। তারপর আবার বাস কেনার টাকা? এরকম হতে পারে না। নিজেরাই অর্থের সংস্থান করুন।"

আরো বিশৃঙ্খলা কি শুধু অর্থনৈতিক বা ফিসক্যাল সংকট ঘনীভূত হওয়ার জন্যই হবে, নাকি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির যে দুরবস্থা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে তার ফলস্বরূপ হবে? আমরা বাঙালিরা অন্যান্য প্রদেশের মানুষের থেকে স্বভাবতই বেশি দুর্নীতিপরায়ণ মনে করার কোনো কারণ নেই। ইদানীং কালে যে দুর্নীতির প্রকোপ আমরা দেখেছি সেটা অনেকটাই অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের পরিণাম। মানুষ সৎভাবে রুটিরুজি উপার্জন করতে না পারলে অসৎ পন্থা অবলম্বন করতে আকৃষ্ট হবে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই।

একটি পুরানো প্রবাদ আছে - Fish rots from the head down. অর্থাৎ মাছ মাথার থেকে পচতে শুরু করে। অফিসের বড় সাহেব চুরি করলে, বড়বাবু, মেজবাবু আর সেজোবাবুকে যুধিষ্ঠির বানিয়ে রাখা দুষ্কর হয়ে পরে। তৃণমূলের অনেক উঁচুস্তরে দুর্নীতির প্রভাব ইতিমধ্যেই জনসমক্ষে এসে গেছে। দুর্নীতি আরো কত ওপর স্তর অবধি ছুঁয়েছে সে সম্বন্ধে অভিযোগ আছে, এখনো অবধি অকাট্য প্রমাণ নেই। যদি কোনো কারণে সেই প্রমাণ চলে আসে, তাহলে শুধু সাধারণ মানুষের বিক্ষোভই বাড়বেনা, শাসকদলের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বাড়বে। তৃণমূলের যে সব কর্মী কোনো আদর্শের ভিত্তিতে তাঁদের দলের জন্য কাজ করছিলেন, তাঁদের দল পরিত্যাগ করার সম্ভাবনা প্রবল ভাবে বাড়বে। পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা - বামফ্রন্টের তিন দশকের বেশি এবং তৃণমূলের বারো বছরের ওপর শাসন - আমরা দেখেছি, তা টিকবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। মা দুর্গা ঘোটকে আসছেন এবং যাচ্ছেন, এর ফল হিসাবেই বলুন বা অন্য কারণেই বলুন, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আগামী এক বছরে কি বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হবে সেটা সময়ই বলে দেবে।

১৯৪৬-এর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজাঃ

বাঙ্গালীর এক আতঙ্কের দিন

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

নোয়াখালি দাঙ্গায় হিন্দুদের ওপর মুসলমান দাঙ্গাকারীদের অত্যাচার নিয়ে জনৈক প্রিয়নাথ সেন লিখছেন, ...বহু স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করা হইয়াছে এবং অনেক স্ত্রীলোকের কুচকি থেকে তলপেট পর্যন্ত কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে...। ফণীভূষণ মজুমদার চিঠিতে লিখছেন, তাঁর কাকা অবনী মোহন মজুমদারকে তার বালকের সামনেই গলা কেটে ছেড়ে দেওয়া হয়। খুব ছটফট করে ১৫ মিনিট পরে তিনি মারা যান। মুরারীমোহন শর্মা লিখছেন, আমার বাবাকে আমার সম্মুখে...... গলা কেটে দেওয়া হয়। ১০-১৫ মিনিট খুব ছটফট করে মারা যান। আর সেই ভয়ংকর দাঙ্গা থামাতে গিয়ে গান্ধী কি বললেন হিন্দুদের? ...আক্রান্ত হওয়ার সময় আক্রমণকারীকে আঘাত না করা, মৃত্যুভয়ে ধর্মান্তরিত হওয়ার বদলে মৃত্যুকে বরণ করা এবং কখনই বাড়ি থেকে পালিয়ে না যাওয়ার... !!! অনেকসময় সত্য বড়ই নিদারুন। অদ্ভুত।

বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলা নিয়ে মেঘনার বাম তীরে অবস্থিত ছিল ব্রিটিশ আমলের নোয়াখালি জেলা। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের এই জেলাতে হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৮%। ১৯৪৬-এর ১০ অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন উৎসবমুখর হিন্দু বাড়িগুলিতে এক ভয়ংকর বিভীষিকা নামিয়ে আনা হয়। গণহত্যা, লুঠ, গৃহে অগ্নিসংযোগ, অপহরণ, ব্যাপকহারে নারী ধর্ষণ, মহিলাদের তুলে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখা এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরণ ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। মুসলিম লীগের প্রাক্তন বিধায়ক মৌলানা গোলাম সারওয়ার ছিলেন এই গণহত্যার মাস্টারমাইন্ড। সুহরাওয়ার্দী সরকার মধ্যযুগীয় বর্বরতার এই খবরগুলি কিছুদিন চেপে রাখে। ১৬ অক্টোবর "যুগান্তর" লিখছে "নোয়াখালি কলকাতার কলঙ্ককেও ম্লান করেছে। হাজার হাজার নিরীহ লোককে অমানুষিকভাবে হত্যা। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারের ঔদাসীন্য। অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগের পর অন্যূন দশ হাজার লোক ধর্মান্তরিত। কয়েক সহস্র মহিলা অপহৃতা।" "যুগান্তর" ১৮ই অক্টোবর লেখে "পাঁচসহস্রাধিক নিহত ও অর্ধলক্ষাধিক বিপন্ন।"

গণহত্যার পূর্ব প্রস্তুতিঃ

১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই নোয়াখালি গণহত্যার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছিল। হিন্দুদের নানারকম হুমকি ও নির্যাতন করাও শুরু হয় এইসময় থেকে। গোলাম সারওয়ার ও তার দলবল গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দিতে থাকে। কলকাতা দাঙ্গার মত নোয়াখালিতেও অশান্তি শুরুর অনেক আগে থেকেই মুসলিম লীগের শিলমোহরযুক্ত প্ররোচনামূলক বিভিন্ন পুস্তিকা বিলি করা শুরু হয়। "The People's Age" সংবাদপত্রটি ১৯৪৬-এর ২৭ অক্টোবর লেখে যে, দাঙ্গা শুরু হওয়ার দু'সপ্তাহ আগে থেকেই সংগঠিত গুন্ডারা খোলাখুলিই অস্ত্রসংগ্রহ করতে থাকে এবং বহু গ্রামে কামারদের বাধ্য করা হয় তাদেরকে অস্ত্র তৈরী করে দিতে।

বাইরের জগতের সঙ্গে নোয়াখালির সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করা হয়। নোয়াখালি যাওয়ার সমস্ত রেলপথ উপড়ে ফেলা হয়। জলপথগুলিতেও কলাপাতা ও কচুরিপানা বিছিয়ে ব্যারিকেডের সৃষ্টি করে রাখা হয়। বিভিন্ন যোগাযোগকারী রাস্তায় গভীর গর্ত খুঁড়ে রাখা হয় ও নৌকা ছাড়ার জায়গাগুলোতে যাওয়ার পথ অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। হিন্দুদের দ্রুত সাহায্যের আর্জি জানিয়ে পাঠানো টেলিগ্রামগুলো পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসের মুসলিম কর্মচারীরা আটকে রাখে। পুলিশ ছাড়া কোন উদ্ধারকারী দলের পক্ষে নোয়াখালির প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি পৌঁছান ছিল অসম্ভব। (ভি.পি. মেনন, 'The Transfer of Power in

JUGANTAR

য়াখালীতে পাঁচসহস্রাধিক নিহত ও অর্দ্ধলক্ষাধিক বিপন্ন

চাঁদপুর সহরের দিকে উন্মত্ত আক্রমণকারীদল

কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের বিমানযোগে উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শনের ব্যবস্থা

য়াখালিতে হত্যা ও অবাধ গুণ্ডামী

পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টে প্ররোচ

'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত নোয়াখালি গণহত্যা-র রিপোর্ট।

India', পৃ-৩২২; সুরঞ্জন দাস, 'Communal Riots in Bengal 1905-47', পৃ-১৯৯)।

ভয়াবহ গণহত্যা শুরুঃ

১৯৪৬-এর ১০ অক্টোবর, লক্ষ্মীপূজার দিন, বৃহস্পতিবার গোলাম সারওয়ার রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত সাহাপুর ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে প্রায় ১৫,০০০ মুসলিম জনতার সামনে প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দেন। এরপরেই গণহত্যা শুরু হয়ে যায়। নোয়াখালির পীড়িতদের, গান্ধীজী ও প্রশাসনিক কর্তা- ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে তাঁদের ওপর অত্যাচারের বিষয়ে লেখা বেশ কিছু হৃদয়-বিদারক চিঠি পাওয়া যায়। কয়েকটির অংশবিশেষ উল্লেখ করলে নোয়াখালির মানুষদের ওপর হওয়া অত্যাচারের মাত্রাটা হয়ত কিছুটা অনুমান করা যাবে। জনৈক হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী লিখছেন, "১৭ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার অনুমান রাত্রি ১১টার সময় ৮-১০ জন মুসলমান গুন্ডা বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া আমার বৃদ্ধ খুড়োমহাশয় শ্রীযুত অক্ষয়কুমার চক্রবর্তীকে (তিনি আজীবন বটগ্রাম উচ্চ প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক ছিলেন) তাঁহার ঘরের সম্মুখ হইতে জোর করিয়া এই বলিয়া টানিয়া লইয়া যায়- "তুমি মুসলমান হইয়াছ, কিন্তু এখনও দুর্গানাম ছাড় নাই। তোমার একখান চিঠি আমার হাতে ধরা পড়িয়াছে। তাহার প্রারম্ভে শ্রীদুর্গা নাম লেখা আছে, তোমাকে দুর্গার সঙ্গে বলি দিব।"... আমার খুড়োমহাশয়কে দুর্বৃত্তগণ ধরিয়া লইয়া যাইতে থাকিলে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন- "বাপু, তোরা অনেকে আমার ছাত্র, আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দে, আমার অপরাধ মার্জনা কর।" কিন্তু দুর্বৃত্তরা তাঁহার কোন কথা কর্ণপাত করে নাই... জনরবে শুনা যায় তাহাঁকে কাটিয়া দক্ষিণ যুগীবাড়ির সম্মুখের পুকুরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে কবর দেওয়া হইয়াছে।" উপেন্দ্রচন্দ্র গোপ লিখছেন যে, তাঁর পুরো পরিবারকে জোর করে ধর্মান্তরিত করার পর তাদেরকে দিয়ে একটি গরু জবাই করান হয় এবং জ্যেঠতুতো-খুড়তুতো ভাইবোনের মধ্যে জোর করে বিবাহ দেওয়া হয়। গ্রামের অন্যান্য পরিবারেও একই ঘটনা ঘটে বলে তিনি জানাচ্ছেন। জনৈক পরিমল চন্দ্র বোসের বাড়ি আক্রান্ত হলে তিনি কোনরকমে পালিয়ে গিয়ে পাশের পুকুর ধারে আশ্রয় নেন। তিনি লিখছেন, "সেখান হইতে আমি দেখিতে পাইলাম দুর্বৃত্তগণ আমার ৩ বৌদি ও ৩ বোনকে কাটিয়া ফেলিল এবং আমার ৬ জন ভ্রাতুষ্পুত্রকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। দুর্বৃত্তগণ আমার তিন ভাইকে বাঁশ দিয়া মারিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে।" নোয়াখালির শচীন্দ্রকুমার ভৌমিক তাঁর চিঠিতে লিখছেন, "আমার গ্রামের চতুঃপার্শ্বের গ্রামে মুসলমানরা আগুন লাগাইয়া দেয়। বহু হিন্দু পরিবারকে মুসলমান করিয়া তাহাদের গোমাংস ভক্ষণ করান হয়। যে দু-একটি বড় বড় পরিবার ধর্মান্তর গ্রহণে অস্বীকার করে তাহাদের পরিবারের সকল লোককে কাটিয়া ফেলা হয়। যুবতী মেয়েদিগকে বলপূর্বক বিবাহ করা হয়। অনেক শিশুকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছে... পার্শ্ববর্তী গ্রামে যখন আগুন লাগে তখন ঐ সকল গ্রাম হইতে বহু আশ্রিত আমাদের গ্রামে আশ্রয় লয়। তাহাদের নিকট শুনিতে পাই যে অত্যাচারী মুসলমানগণ তাহাদেরই প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব।" জনৈক প্রিয়নাথ সেনও একইরকম লিখছেন, "আমাদের পার্শ্বের গ্রামের বহু হিন্দু বাড়ি পোড়াইয়া দেওয়া হুইয়াছে এবং অনেক শিশুকে ঐ অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। অনেক হিন্দুকে মুসলমান করা হইয়াছে এবং গরুর মাংস খাওয়ান হইয়াছে। বহু স্ত্রীলোক অপহৃত হইয়াছে। বহু স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করা হইয়াছে এবং অনেক স্ত্রীলোকের কুচকি থেকে তলপেট পর্যন্ত কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অনেক স্ত্রীলোকের স্তন কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

বিভিন্ন চিঠি থেকে খুব নিষ্ঠুর উপায়ে হত্যা করার কয়েকটি ঘটনা জানা যায়। ফণীভূষণ মজুমদার চিঠিতে লিখছেন, তাঁর কাকা অবনী মোহন মজুমদারকে তার বালকের সামনেই গলা কেটে ছেড়ে দেওয়া হয়। খুব ছটফট করে ১৫ মিনিট পরে তিনি মারা যান। মুরারীমোহন শর্মা লিখছেন, আমার বাবাকে আমার সম্মুখে লাঠি ও গরু কাটার ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। গলা কেটে দেওয়া হয়। ১০-১৫ মিনিট খুব ছটফট করে মারা যান। গৌরাঙ্গচন্দ্র নাথ লিখছেন, তাঁর কাকা জগবন্ধুসহ গ্রামের ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শান্তিসভার আশ্বাস দিয়ে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাদের প্রথমে লাঠি দিয়ে মেরে তারপর গলা কেটে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ইতিহাসবিদ সুরঞ্জন দাসের মতে, জনতা চেয়েছিল হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে- তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে, তাদের পূজিত মূর্তিকে অপবিত্র করে, তাদের মহিলাদের ধর্ষণ করে এবং তাদের জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে ('Communal Riots in Bengal 1905-47', পৃ-১৯৬)। অন্বেষা রায় তাঁর কেমব্রিজ থেকে সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'Making Peace, Making Riots: Communalism and Communal Violence, Bengal 1940-1947' –এ বলেছেন, ধর্মান্তরণ ছিল এই নোয়াখালি দাঙ্গার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য- যা অন্যান্য

দাঙ্গা থেকে একে পৃথক করেছে। তাঁর মতে, জোর করে ধর্মান্তরণ ছিল পূর্বপরিকল্পিত, কোন স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয়। তিনি আরও লিখেছেন, দাঙ্গা ছিল সম্পূর্ণরূপে পূর্বপরিকল্পিত এবং লীগ নোয়াখালিকে পাকিস্তান গঠনের পরিকল্পনার গবেষণাক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিল। রায়ের মতে, শ্রেণীগত স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা না গেলেও হিংসার ভয়াবহতা থেকে বোঝা যায় এর পিছনে মূল কারণ ছিল ধর্মীয়। অশোকা গুপ্ত লিখেছেন যে, ধর্মান্তরণের পর হিন্দুদের তাদের খুড়তুতো-জ্যেঠতুতো বোনেদের বিয়ে করতে বাধ্য করা হত। শান্তনু সিংহের 'নোয়াখালি নোয়াখালি' অনুযায়ী, নোয়াখালি জেলার দাঙ্গা কবলিত গ্রামগুলিতে এমন পরিবারের সংখ্যা খুব কমই ছিল, যে পরিবারের কোন না কোন মেয়ে অপহৃতা বা ধর্ষিতা হয়নি।

গণহত্যার পরঃ

বিভিন্ন সংগঠন নোয়াখালিতে ত্রাণকার্য চালায়। এর মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সংঘ ত্রাণকার্যের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা দুঃসাহসী অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের শান্তিরক্ষাকারী কমিটিগুলোকে বলা হত 'রক্ষী দল'। এরা যেসমস্ত হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করেছিল, তাঁদের আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন। হিন্দু মহাসভাও নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার বহু জায়গায় ত্রাণ কেন্দ্র খোলে। ত্রাণকারী দল গ্রামে গ্রামে ঘুরলেও সেখানকার হিন্দুরা ভয়ে কিছু বলতে চাইছিল না। তাদের মুসলিমরা স্থানীয় ভাষায় ভয় দেখিয়েছিল, "কিছু কইবা তো কাইটা ফালাইমু" (রেণু চক্রবর্তী, 'Communists in Indian Women's Movement 1940-1950', পৃ-১০৫)।

নোয়াখালির গণহত্যায় বিচলিত হয়ে আইসিএস শৈবাল গুপ্তের স্ত্রী বিশিষ্ট সমাজসেবিকা অশোকা গুপ্ত কারও নির্দেশ বা অনুরোধের অপেক্ষায় না থেকে শিশু পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়ান। ১৯৪৬-এর ২০ অক্টোবর তিনি কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে রিলিফের কাজ শুরু করেন। তাঁর 'নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে' গ্রন্থে (পৃ-৩৪) তিনি এক অল্পবয়স্ক দম্পতির মর্মন্তুদ একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন- একজন মহিলাকে তিনি অনেক কষ্টে রাজি করিয়ে লক্ষ্মীপুর থানায় নিয়ে আসেন অভিযোগ লেখাতে। মহিলাটি এল এবং লম্বা ঘোমটা টেনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার মাঝে জানাল, অত্যাচার শেষ হয়ে যাবার দুই মাস পর পর্যন্তও প্রতি রাতে কয়েকজন মুসলমান তাকে ধরে নিয়ে যেত এবং 'ব্যবহার' করে সকালবেলা ফেরত দিয়ে যেত। থানার দারোগা তাদের নাম জানতে চাইলেন। তারা বলল নাম বলা মানে অবধারিত মৃত্যু।

মুসলিম বাড়িতে আটক থাকা বহু হিন্দু মেয়ে উদ্ধারে সুচেতা কৃপালিনী বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। অশোকা গুপ্তের বয়ান অনুযায়ী, সুচেতা নোয়াখালিতে এতটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন যে গোলাম সারওয়ার ঘোষণা করেছিল- যে সুচেতাকে ধর্ষণ করতে পারবে তাকে 'গাজী' উপাধি দেওয়া হবে। সুচেতা তাই নিজের গলায় একটি সায়ানাইডের ক্যাপসুল নিয়ে নোয়াখালিতে চলাফেরা করতেন ('নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে', পৃ- ৬২- ৬৩)। তদানীন্তন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালিনীর স্ত্রীরই যদি এই অবস্থা হয় নোয়াখালিতে- তাহলে বাকি হিন্দু মহিলারা কিভাবে জীবনযাপন করছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

নোয়াখালিতে গান্ধীজীঃ

নোয়াখালিতে গণহত্যার ভয়াবহতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নেলি সেনগুপ্ত প্রমুখ গান্ধীজীকে টেলিগ্রাম মারফৎ জানান। গান্ধীজী নোয়াখালি গণহত্যা শুরু হওয়ার প্রায় ১ মাস পরে ১৯৪৬-এর ৭ নভেম্বর নোয়াখালি পৌঁছন এবং ১৯৪৭ এর ২ মার্চ নোয়াখালি ত্যাগ করেন। তাঁর এই চার মাসব্যাপী সফরের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে তাঁর সফরসঙ্গী অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর বই 'My Days with Gandhi' তে। এখানে আমরা পাই যে, "গান্ধী হিন্দুদের পরামর্শ দেন অহিংসার পথে থাকতে এবং আক্রান্ত হওয়ার সময় আক্রমণকারীকে আঘাত না করা, মৃত্যুভয়ে ধর্মান্তরিত হওয়ার বদলে মৃত্যুকে বরণ করা এবং কখনই বাড়ি থেকে পালিয়ে না যাওয়ার। মহিলাদের পরামর্শ দেওয়া হয় নিজেদের সম্মানহানি হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করার জন্য এবং হিন্দুদের ভালবাসার উপদেশ তিনি দেন মুসলিমদের"। এটি বলেই নির্মলবাবু উপসংহার টেনেছেন, "তাঁর (গান্ধীজীর) এই পরামর্শের যাই প্রভাব হিন্দুদের ওপর হোক না কেন, সাধারণ মুসলিমদের কাছে তাঁর আবেদনের প্রায় কোন ফলই হয়নি।"

গান্ধীর নোয়াখালি সফরের এক সঙ্গী কমলা দাশগুপ্ত বলেছেন, গান্ধী যখন নোয়াখালির বিভিন্ন জায়গা হেঁটে ঘুরে বেড়াতেন রাস্তার পাশে কিছু মুসলিম এবং খুব অল্পসংখ্যক হিন্দু দাঁড়িয়ে থাকত। বাপু মুসলিমদের সালাম ও হিন্দুদের নমস্কার করতেন। কিন্তু মুসলিমদের খুব কম জনই তার সেলামের উত্তর দিত। গান্ধী এখানে থাকার সময় মুসলিমদের বিভিন্ন হুমকি চিঠি পেতে থাকেন, যাতে তাঁকে বিহারে চলে যাবার কথা বলা হয়। নির্মল কুমার বসু-র লেখা থেকে আরও জানা যায় যে, "ইতিমধ্যে (ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭) নোয়াখালিতে গান্ধীর অবস্থানের বিরুদ্ধে মুসলিম প্রতিবাদ আরও জোরাল হয়, ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে তা কুৎসিত রূপ নেয়। তিনি যে রাস্তা দিয়ে যাবেন, তা প্রতিদিন নোংরা করে রাখা হত ইচ্ছা করে এবং তাঁর সভায় মুসলিমদের যোগদান দিন দিন কমতে থাকে"। কোন আশা নেই বুঝে গান্ধীজী ২রা মার্চ নোয়াখালি ত্যাগ করেন। দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবিভাগকেও অনিবার্য করে তোলে নোয়াখালি।

ভারতে নারী সংরক্ষণ আইন

রাজগোপাল ধর চক্রবর্তী

২৭ বছর ধরে সংসদে শুধুমাত্র আলোচনায় ছিল মহিলা সংরক্ষণ বিল। মোট ৫ বার সংসদে পেশ হওয়া সত্ত্বেও এই বিল পাস করাতে ২৭ বছরে ব্যার্থ ৪টি সরকার। মজার কথা, মূলত যাদের বিপুল বিরোধিতায় দীর্ঘ সময় ধরে এই বিল পাস করানো যায়নি আজ তাঁরা 'ইন্ডি' জোটে কংগ্রেসের সঙ্গে এক মঞ্চে! আর ২৭ বছর বাদে প্রায় ৪৯ শতাংশ মহিলা ভোটারের দেশ ভারতে নারীর সম্মান ফিরিয়ে দিল বিজেপির সরকার। নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে অবশেষে পাস হল মহিলা সংরক্ষণ বিল বা 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম'। তিনিই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি বারেবারে বলেছেন, "মহিলাদের জন্য শুধুমাত্র উন্নয়ন পরিকল্পনা নয়, মহিলাদের নেতৃত্বেই হবে নতুন ভারতের বিকাশ"।

সংসদের নিম্নকক্ষ এবং রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসনের গ্যারান্টি দিয়ে ভারতবর্ষের সংসদ একটি বিল পাস করেছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩, সংসদের নিম্নকক্ষে আর পরের দিন রাজ্যসভায় 'নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম' বিপুল ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। তবে পরবর্তী জনগণনা এবং ডিলিমিটেশন (নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের অনুশীলন) প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর এই বিল কার্যকর করা যাবে। বিলটি লোকসভা, দিল্লি সমেত সব রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য সমস্ত আসনের এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ করবে। ৫৪৫ সদস্যের লোকসভায় তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির জন্য ১৩১টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে। সংরক্ষিত আসনগুলির ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযোজ্য হবে। একই নিয়ম চলবে রাজ্য বিধানসভায়। একবার কার্যকর হয়ে গেলে ১৫ বছরের জন্য তা স্থায়ী হবে। তবে সংসদ দেশে প্রয়োজন বুঝে আইনটির মেয়াদ বাড়াতে পারবে।

সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল ২০২৩ পাস হওয়ার পর দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিজেপির ২০১৪ সালের সংকল্পপত্রে বলা হয়েছিল, "সরকারের মধ্যে সমস্ত স্তরে মহিলাদের কল্যাণ ও উন্নয়নকে উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং বিজেপি একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় ও রাজ্য বিধানসভায় ৩৩% সংরক্ষণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০১৯ সালের সংকল্পপত্রে একই কথার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। ২০১৪ সালে বিজেপি নিজস্ব সংসদীয় শক্তিতে এই বিল পাস করানোর জায়গায় ছিলনা। বিল আনলে নানান অজুহাতে অন্যরা বানচাল করে দিত। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়লাভ এবং ধীরে ধীরে মিত্রশক্তির সহায়তায় রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি আসায় বিরোধীদের ভিন্ন পথে হাঁটতে দেয় নি। এর আগে আরজেডি আর সমাজবাদী দল নারী সংরক্ষণের বিরোধিতা করেছে। এবার সে সাহস দেখায় নি। লোকসভার উপস্থিত ৪৫৬ জন সাংসদের মধ্যে ৪৫৪ জন মহিলা বিলের পক্ষে ভোট দেন। বিরোধিতা করেছে হায়দ্রাবাদের মিম দলের দুই সংসদ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে এটি "নারীর ক্ষমতায়নকে বাড়িয়ে তুলবে এবং আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের বৃহত্তর অংশগ্রহণকে সক্ষম করবে"। বিরোধী রাজনীতিবিদরা অভিযোগ করেছেন যে সরকার সময়সীমাটি "অস্পষ্ট" রেখে "লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মহিলা ও মেয়েদের আশার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে"। অবিলম্বে এই আইন কার্যকর করার দাবি জানিয়ে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী প্রশ্ন তোলেন, "তাদের আর কত বছর অপেক্ষা করতে হবে - দুই, চার, আট বছর"? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, দীর্ঘ দশ বছর (২০০৪-১৪) ভারতে 'গান্ধী পরিবার' নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস দল শাসন ক্ষমতায় থেকেও কেন মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য আনতে সচেষ্ট হয়নি?

মহিলা ভোটার

ভারতীয় মহিলারা ক্রমান্বয়ে আরও শিক্ষিত হয়ে উঠছেন এবং বিভিন্ন আর্থিক কাজকর্মে তারা নিযুক্ত। তাঁরা বিশাল সংখ্যায় একত্রিত হয়ে, বিশেষ করে সেলফ হেল্প গ্রুপে অংশ নিচ্ছে। এতে তাঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতার সঙ্গে রাজনৈতিক সচেতনতাও তৈরি হচ্ছে। নির্বাচনের দিন ভারতের নির্বাচন কমিশন এখন মহিলাদের জন্য পৃথক লাইনের ব্যবস্থা করেছে এবং ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা থাকায় মহিলাদের ভোটে অংশগ্রহণ করার ভয় কমেছে। ফলে মহিলারা আরও বেশি মাত্রায় ভোট দিতে উৎসাহিত। ১৯৬৭ সালে পুরুষ ভোটার, মহিলাদের থেকে ১০- ১২ % শতাংশ বেশি ছিল। এখন মহিলারা পুরুষদের চেয়ে বেশি মাত্রায় ভোট দিচ্ছে। ২০১৯ সালে পুরুষ ভোটারের ৬৭.০২ % ভোট দিয়েছে, মহিলা ভোটারের ৬৭.১৮% ভোট দিয়েছে। উত্তর পূর্ব ভারতের অরুণাচল, ত্রিপুরা, অসম, নাগাল্যান্ড এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, লাক্ষাদ্বীপ, পুডুচেরী ,দাদরা ও নগর হাভেলি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৮০ শতাংশের বেশি মহিলা ভোট দিয়েছেন। জম্মু-কাশ্মীরে মহিলা ভোটার ছিল সবচেয়ে কম। মাত্র ৪৩.৭ শতাংশ।

নারীর ক্ষমতায়ন ও সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব

একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে দেশে সামাজিক ও আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত প্রয়োজন। নারীর ক্ষমতায়ন নির্ভর করে কন্যা সন্তান এবং মহিলাদের লেখাপড়ার ওপর। বিশেষ করে প্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রোজগার আর আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের ওপর। আমাদের দেশে এখনও সর্বত্র নারী-পুরুষের বিভাজন রয়েছে। ভারতে উচ্চশিক্ষায় মোট তালিকাভুক্তদের মধ্যে ৫১.৩% পুরুষ এবং ৪৮.৭% মহিলা। শ্রমবাজারেও নারীর সামগ্রিক অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি রিপোর্ট ২০২২-এর অনুমান অনুযায়ী, ভারতে পুরুষরা শ্রম আয়ের ৮২ শতাংশ এবং মহিলারা ১৮ শতাংশ উপার্জন করেন। যুগ যুগের বঞ্চনা রাতারাতি দূর হবে না, তবে আইনসভায় আরও মহিলাদের অংশগ্রহণ তাঁদের নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করবে। আমাদের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, আইনগত সুরক্ষা ছাড়া মেয়েদের আইনসভায় পাঠানো মুশকিল। নিচের টেবিলে আমরা বেশ কিছু দেশের আইনসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব তুলে ধরলাম। ভাবতে খারাপ লাগছে, আমরা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের থেকেও পিছিয়ে। এমত অবস্থায় আইনসভায় নারীসুরক্ষা আইন ভারতীয় নারীদের জগৎসভায় স্থান করে দেবে।

প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা জী।

সংসদের নিম্নকক্ষে মহিলা আইনপ্রণেতাদের শতাংশ হিসাব ১৯৯৫ এবং ২০২০ সাল

দেশ	১৯৯৫	২০২০	দেশ	১৯৯৫	২০২০
রুয়ান্ডা	৪.৩	৬১.৩	ভুটান	০.০	১৪.৯
স্পেন	১৬.০	৪৪.০	পাকিস্তান	১.৮	২০.২
যুক্তরাজ্য	৯.২	৩৩.৯	বাংলাদেশ	১০.৩	২০.৯
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১০.৯	২৩.৪	ভারত	৭.২	১৪.৪
ইজরায়েল	৯.২	২৩.৩	ভিয়েতনাম	১৮.৫	২৬.৭
ইতালি	১৫.১	৩৫.৭	সিঙ্গাপুর	৩.৭	২৪.০
দক্ষিণ আফ্রিকা	২৫.০	৪৬.৪	লাও পিডিআর	৯.৪	২৭.৫
বেলজিয়াম	১২.০০	৪০.৭	চীন	২১.০	২৪.৯
অস্ট্রেলিয়া	৮.৮	৩০.৫	সংযুক্ত আরব আমিরশাহি	০.০	৫০.০

সূত্র: সংসদে নারী: ১৯৯৫-২০২০ পর্যালোচনা ২৫ বছর, ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন ২০২০

নির্বাচনী ইস্তেহার ও নারী সুরক্ষা

বিজেপি দলের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা আছে, "বিজেপি সমাজের উন্নয়ন এবং দেশের প্রবৃদ্ধিতে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয় এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও কল্যাণকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিজেপি নারীর ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত হিসাবে ··· একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় এবং রাজ্য বিধানসভায় ৩৩% সংরক্ষণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ"। ২০১৯ সালের ইশতেহারেও একই কথার প্রতিধ্বনি ঘটে। ২০১৪ সালের ইশতেহারে মহিলা সংরক্ষণের ব্যাপারে কোনো কথা বলেনি জাতীয় কংগ্রেস। ২০১৯ সালের ইশতেহারে অবশ্য বলেছে। সিপিআইএম-এর ২০১৪ সালের নির্বাচনী ঘোষণায় নারী সংরক্ষণের কথা বলা আছে। কংগ্রেস বা সিপিআইএম শাসনে নেই, তবু নারী সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোনও বেসরকারি বিল তাদের কোনও সদস্য আনেন নি। তৃণমূল কংগ্রেস তার ইশতেহারে ৬১টি বিষয়ে জোর দিয়েছে, মেয়েদের কন্যাশ্রী প্রকল্পের কথা বললেও সংসদ ও বিধানসভায় নারী সুরক্ষা আইন আনার ব্যাপারে কোনো কথা বলেনি।

বহু বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ"। বহুল প্রচারিত এই উদ্ধৃতি। আমাদের প্রিয় কবি নজরুল ইসলাম লিখলেন, "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"। তবুও টনক নড়েনি। সবাই বুঝলেও, বললেও কেউ কথা রাখেনি, নরেন্দ্র মোদী কথা রাখলেন। অন্য সব রাজনৈতিক দল নারীদের এই অধিকার স্বীকার করতে বাধ্য হোল। অবশেষে শুরু হল নবজাগরণ। যে কোনো মূল্যে আমাদের রক্ষা করতে হবে এই নারী পুরুষের সমতা।

নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম

আবহমান কাল থেকেই ভারতে বিদ্যমান

স্বাতী সেনাপতি

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নারীরা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণে তার প্রমাণ স্পষ্ট। আবহমান কাল থেকে নারী বন্দনাকেই যেন একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজনীতির ময়দান হোক বা শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্ষমতায়ন, বৌদ্ধিক বিকাশ ও চেতনার যে মশাল নারীরা মহাভারতের যুগ থেকে জ্বালিয়ে রেখেছেন সেই শিখাকেই আরও একটু উজ্জ্বল করে দিল মোদি ক্যাবিনেট।

নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম বা মহিলা সংরক্ষণ বিল লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাশ হল। দুর্গাপূজার আগে দেশের মা, বোনদের জন্য সেরা উপহারের পাশাপাশি ভারতের মাতৃশক্তি বন্দনার ক্ষেত্রেও অন্যতম নিদর্শন মহিলা সংরক্ষণ বিল। প্রায় তিন দশকের জট কাটিয়ে প্রায় অসাধ্য সাধন করল কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রসঙ্গে অবধারিতভাবে আসে ঐতিহাসিক শাহবানু মামলা প্রসঙ্গ। ১৯৮৬ সালে সুপ্রিম কোর্ট যখন ঐতিহাসিক শাহবানু মামলায় রায় দিয়েছিলেন তখনই এই সামাজিক প্রথার অবসানে আইন পাশ করা যেত। সেই সময় লোকসভায় ৫৪৫ জন সাংসদের মধ্যে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন ৪০০ জন। রাজ্যসভায় ২৪৫ জন সাংসদের মধ্যে ১৫৯ জন কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। অথচ তদানিন্তন রাজীব গান্ধীর সরকার তাদের শক্তি ব্যবহার না করে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে তাৎপর্যহীনে পরিণত করে, যার ফলে মুসলমান মহিলারা তাঁদের সাংবিধানিক এবং মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। শুধু মুসলিম মহিলাই কেন ভারতীয় সমাজে নারী ক্ষমতায়নের দৃষ্টান্ত হতে পারত এই মামলা। সেই শাপমোচনও ঘটে মোদি ক্যাবিনেটের হাত ধরেই। বলাই বাহুল্য কংগ্রেস সহ অন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সাপের ছুঁচো গেলার মত করে এই বিল সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু ছিদ্রান্বেষণকারী ইতিমধ্যেই নানা ছিদ্র খুঁজতে শুরু করেছেন। কিন্তু কেন? বর্তমান যুগে নারীর ক্ষমতায়ন, নারী মুক্তি, নারী স্বাধীনতা নিয়ে সকলেই নানা কথা বললেও মোদি সরকারই এই নারী মুক্তির স্বপ্নকে সাকার করলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "একটি রাষ্ট্রের অগ্রগতি জানার

সবচেয়ে ভাল উপায় হল সেই রাষ্ট্রে নারীর অবস্থান।" স্বামী বিবেকানন্দের দেখানো পথেই, প্রগতিশীলতাকে মানত্যা দিয়েই এই মহিলা সংরক্ষণ বিল। এতে করে ভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় মহিলাদের আরও বেশি করে পা পড়বে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নারীরা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে বৈদিক যুগ ও ক্রমেই মধ্যযুগেও রাজনীতির আঙিনায় মহিলারা বীরদর্পে এগিয়ে গিয়েছেন এমন বহু প্রমাণই আমরা পেয়েছি। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণে তার প্রমাণ স্পষ্ট।

রামায়ণে কৈকেয়ী

রামায়ণে খলনায়িকা কৈকেয়ীর প্রতিহিংসাপরায়ণ রূপ দেখে আমরা অভ্যস্ত হলেও তাঁর চরিত্রের একটি দিক রয়ে গেছে সম্পূর্ণ অগোচরে। অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন কৈকেয়ী। রাজা দশরথের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার পাশাপাশি অশ্ব চালনাতেও ছিলেন পারদর্শী। এমনকি কৈকেয়ীর যুদ্ধের রথের সারথী হওয়ার উল্লেখও পাওয়া যায়। মহাভারতের যুগেও একাধিক নারীর প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহাভারতে সত্যবতী

মহাভারতে রাজমাতা সত্যবতী ছিলেন তৎকালীন রাজনীতির অন্যতম ভরকেন্দ্র। একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া, দক্ষ হাতে রাজকাজ পরিচালনা করায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। তাঁর এই সকল গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায় দেবীভাগবতপুরাণ এবং হরিবংশ পুরাণেও। রাজপরিবারে বারবার উত্তরাধিকার নিয়ে সংকট দেখা দিলে তিনিই তা সামাল দিয়েছেন। তাঁর সময়কালে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন আসে। যৌথ সম্পত্তির মালিকানার বদলে প্রাধান্য পেতে শুরু করে ব্যক্তি মালিকানা।

মহারানী কুন্তী

সত্যবতীর পর যাঁর নাম অব্যবহিত পরে আসে তিনি মহারানী কুন্তী। মহাভারতের যুদ্ধের অন্যতম হোতা বলা চলে মহারানী কুন্তীকে। তৎকালীন রাজনীতির স্তম্ভ ছিলেন তিনি। কুন্তী তথা পৃথাকে বাল্যকালে

বায়ুসেনায় ভারতের নারী শক্তি।

এশিয়ান গেমসে বিজয়ী ভারতের নারী শক্তি।

তাঁর পিতা আর্যশুর দান করে দেন রাজা কুন্তীভোজের কাছে। কন্যা সন্তান বলেই তাঁকে দান করায় ওইটুকু বয়সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেন "পুত্র নই বলে দান করা হল আমাকে। ইতিহাস একদিন বলবে, পৃথা কোনও অংশে কম ছিল না পুরুষের চাইতে"। কুন্তীভোজের রাজত্বে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকা পৃথা কিশোর বয়সেই আচার্য নরোত্তম ভট্টের কাছে রপ্ত করেছিলেন ভারতীয় ইতিহাস, শাস্ত্র ও রাজনীতি। পাহাড়ি যুবকদের নিয়ে তৈরি করেছিলেন ছোট ছোট গুপ্তচর সংগঠন। পরবর্তী কালে মহাভারতের যুদ্ধে পাঁচ পুত্রকে নিয়ে রাজনৈতিক পরামর্শ করার সময় বারবার তাঁর মনীষার প্রমাণ পাওয়া যায়।

“সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি
মহাবাহু।” —মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা

মহাভারতের বৃহৎ পরিসরে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। পুত্র সন্তান না থাকায় পুত্রের সমকক্ষ করেই তাঁকে মানুষ করে তুলেছিলেন তাঁর পিতা। ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী চিত্রাঙ্গদাকে তৈরি করা হয়েছিল রাজকার্য পরিচালনার যোগ্য করেই।

মহাভারতের জনা

মহাভারতের অপর এক বিশ্রুত নারী চরিত্র জনা। পাণ্ডবদের অশ্বমেধের ঘোড়া জনার পুত্র প্রবীর বন্দি করেছিল। নীলধ্বজ সেই ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে বললে পুত্র প্রবীর ফেরৎ না দিয়ে মাতা জনার অনুপ্রেরণায় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে প্রবীর মৃত্যুবরণ করে। তখন স্বয়ং জনা যুদ্ধে অগ্রসর হলে কৃষ্ণের কৌশলে পাণ্ডবরা রক্ষা পায়।

বৈদিক যুগেও নারী স্বাধীনতা, নারী শিক্ষার বহু উদাহরণ আমরা পাই। গার্গী, মৈত্রী, অপালা তো ছিলেনই। পাশাপাশি রাজনীতি, যুদ্ধের ময়দানেও বেশ কিছু মহিলার নাম আমরা পাই। ঋগবেদে নারীর

সৃজনশীল নারী শক্তি।

যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করার উদাহরণ পাওয়া যায়। ঋগবেদে মুদ- গলিনীর যুদ্ধ জয়ের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এছাড়াও যুদ্ধক্ষেত্রে বিশপলা, বধ্রিমতী, শশীয়সী ইত্যাদি নারীর বীরত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শুধু বৈদিক যুগ না মধ্যযুগ হোক বা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় আমরা বহু নারীর উল্লেখ পাই। পৌরাণিক ও বৈদিক যুগে হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়া নারীদের প্রতিফলনই পরবর্তীতে দেখা যায় রাণী লক্ষ্মীবাই, রাণী ভবানী, রাণী ভবশঙ্করী।

জবালা সত্যকাম

উপরের এই নামগুলি কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তি ভারতবর্ষে নতুন কোনও ধারণা একেবারেই নয়। বরং পাশ্চাত্যের তথাকথিত ফেমিনিজম শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই তা আমাদের সমাজে বিদ্যমান। জবালা সত্যকামের উদাহরণই যদি দেখা যায় আমরা কি দেখতে পাই? গোত্র জানতে চাওয়ায় সত্যকামকে , জবালা জানান পিতৃপরিচয় নেই তার। জবালার সন্তানই তার একমাত্র পরিচয়। 'সিঙ্গেল মাদার' , নারী স্বাধীনতার সবথেকে বড় উদাহরণ কি নয় এটা ! পঞ্চসতীর কথা আমরা অনেকেই জানি। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী - এঁরা কেউই তথাকথিত একগামী ছিলেন না। বর্তমানে পাশ্চাত্য ফেমিনিজমের মত অবাধ যৌণ স্বাধীনতা নয় বৈদিক যুগে ফেমিনিজম ছিল আক্ষরিক অর্থেই নারীর দৈহিক ও মানসিক চেতনার বিকাশ। মহাভারতের শান্তি পর্বে আমরা দেখতে পাই পিতামহ ভীষ্ম বলছেন মায়ের থেকে বড় গুরু কেউ নেই। মনু বলেছেন, "যত্র নার্যস্তু পয়জ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। / যত্রৈতাস্তন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রফলাঃ ক্রিয়া।" অর্থাৎ যেখানে নারী পূজিতা, সেখানে দেবতাও খুশি হন, যেখানে তাঁদের পূজা নেই, সেখানে সকল ধর্মকর্মই নিস্ফল।

আবহমান কাল থেকেই নারী বন্দনাকেই যেন একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। কাজেই বলা যায় রাজনীতির ময়দান হোক বা শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্ষমতায়ন, বৌদ্ধিক বিকাশ ও চেতনার যে মশাল নারীরা মহাভারতের যুগ থেকে জ্বালিয়ে রেখেছেন সেই শিখাকেই আরও একটু উজ্জ্বল করে দিল মোদি ক্যাবিনেট।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ইসরো-র নারী শক্তি।

জি ২০: ভারতের কিস্তিমাত

শিশির বাজোরিয়া

ওয়ান ওয়ার্ল্ডের সত্যিকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভারতের সভাপতিত্বে এক টেবিলে পাশাপাশি এখন আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। সত্যি অর্থে গ্লোবাল সাউথের আকাশছোঁয়া নেতা নরেন্দ্র মোদী তাঁর সময়কালেই বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতকে নিয়ে যাবে পঞ্চম থেকে তৃতীয় স্থানে। এই ইতিহাস নির্মাণ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

১৯৯৯ সালের জুন মাসে জার্মানির কোলন শহরে জি২০-র সূচনা হয়েছিল জি৭-এর মধ্যে দিয়ে, অর্থনৈতিক সংকটের পরে। ১৯৯৪ সালে রাশিয়ে যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জি৭ হয়ে ওঠে জি৮। কিন্তু ২০০৮ সালের ব্যাংকিং সংকটের সময় গোটা বিশ্ব বুঝতে পারে যে আরও অনেক দেশকে এর (জি৮) মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং প্রতিনিধি হিসাবে শুধু অর্থমন্ত্রী নয়, নিয়ে আসতে হবে রাষ্ট্রপ্রধানদের। ১৯টি দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন- কে (ইইউ) সঙ্গে নিয়ে জি২০ মঞ্চের মূল কেন্দ্রবিন্দু গ্লোবাল ইকোনমি। ইইউ ছাড়া বাকি ১৯টি দেশ ৫টি গ্রুপে বিভক্ত। এই মঞ্চের কোন স্থায়ী সচিবালয় নেই। পর্যায়ক্রমে যে দেশ যখন সভাপতিত্ব করে সেখানেই জি২০ মঞ্চের সচিবালয় হয়। ১৮তম শীর্ষ সম্মেলনে জি২০ প্রেসিডেন্সির বিশেষাধিকার পেয়েছিল ভারত এবং সেই সম্মান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পেয়েছিলেন ঐতিহাসিক হিন্দু দ্বীপ বালি-তে। আজ পর্যন্ত শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২ বার জি২০ প্রেসিডেন্সির দায়িত্ব পেয়েছে (১ম ও ৩য়)।

ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতির হাতে পরবর্তী জি২০ দায়িত্বভার তুলে দিচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বসুধৈব কুটুম্বকমঃ এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ বসুধৈব কুটুম্বকমের দর্শনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে মোদীজি ভারতকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন গ্লোবাল সাউথের সত্যিকারের নেতা হিসাবে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা শীর্ষ সম্মেলনের আগে ১২৫টি দেশের সঙ্গে বৈঠক করেছি যা ভারতকে প্রকৃত অর্থে গ্লোবাল সাউথের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক কণ্ঠস্বর হিসাবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। সম্মেলনকে সফল করতে একেবারে গোড়ায় মোদীজী সব দেশের সঙ্গে কথা বলে সবার সম্মতি নিয়ে, আমন্ত্রন জানান আফ্রিকান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আজালি আসুমানিকে। স্থায়ী সদস্য হিসেবে আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি২০ মঞ্চে ভারতের ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হয় সর্বসম্মতিক্রমে। ওয়ান ওয়ার্ল্ডের সত্যিকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভারতের সভাপতিত্বে

আনন্দের আলিঙ্গনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও আফ্রিকান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট।

এক টেবিলে পাশাপাশি এখন আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

ভারতের সভাপতিত্বের সময়কালে (১০ মাস) মোদীজির ভাবনাকে রুপায়িত করতে সব রাজ্যের ৬৬টি শহরে জি২০ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব বৈঠকে প্রায় ১ লক্ষ বিদেশী প্রতিনিধি/অংশগ্রহণকারীরা আমাদের দেশের অধিকাংশ জায়গা ঘুরে দেখছেন। যেসব শহর কখনও কোনদিন বিদেশী দর্শনার্থীদের দেখেনি সেখানেও গেছেন বিদেশী প্রতিনিধিরা। এর দুরকম ফলাফল হয়েছে - বিদেশীরা ভারতের সেই সব জায়গায় গেলেন সাধারণত যে ভারতকে তাঁরা আগে দেখেনি। আর আমাদের দূর-দূরান্তের প্রতন্ত্য শহরের মানুষজনদের সঙ্গে দেখা হল বিদেশি প্রতিনিধিদের যা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেনি। বিদেশীদের জন্য সত্যিকারের ভারত-দর্শন এবং ভারতীয়দের জন্য এ ছিল নিজের শহরে বসে বিশ্ব-দর্শন। কাশ্মীরে অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫এ বাতিল হবার পর এই প্রথম বিশ্ব দেখল কাশ্মীরের আসল সৌন্দর্য। বহু দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্বে বিভক্ত আজকের বিশ্ব - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম রাশিয়া; আমেরিকা বনাম চীন; চীন বনাম জাপান কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের 'দিল্লি ঘোষণা' ছিল এক অভূতপূর্ব সাফল্য। এই প্রথমবার জি২০ মঞ্চে কোনো নোট ছাড়াই সর্বসম্মতভাবে 'দিল্লি ঘোষণা'-র মাধ্যমে সমাপ্ত হয় শীর্ষ সম্মেলন। অর্থনৈতিক ভাবে এবারের এই জি২০ সম্মেলনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল, ইন্ডিয়া- মিডল ইস্ট-ইউরোপ করিডোরের (IMEEC) ঘোষণা। ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ এই করিডোর আমাদের জন্য মধ্যপ্রাচ্য (ইসরায়েল সহ) এবং ইউরোপের সাথে সরাসরি সংযোগের পথ খুলে দেবে। এটি আমাদের সুয়েজ খালের একটি বিকল্প বাণিজ্য পথও খুলে দেবে। সুয়েজ খাল বছরের পর বছর বানিজ্যের উপযোগী হলেও এতদিন এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের অন্য কোন বিকল্প বাণিজ্য পথ ছিলনা। দুর্ঘটনাবশত দীর্ঘ

এবং খুব সরু সুয়েজ খালে একবার একটি জাহাজ আটকে গিয়ে অনেকদিন দাঁড়িয়ে থাকায় মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল বিশ্ব বানিজ্যে। এবারের সম্মেলন মঞ্চে ঘোষিত এই করিডোরটি ইতিমধ্যেই অযোগ্য প্রমাণিত, চিনের স্বার্থে চিনের তৈরি বেল্ট রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই)-এর বিরুদ্ধে এক বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। ইতালির প্রধানমন্ত্রী যখন বিআরআই থেকে তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করেছিলেন তখনই নড়েচড়ে বসেছিল চিন। খুব সম্প্রতি নেপালও বিআরআই ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সম্মেলনে মূল মঞ্চের পাশপাশি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি - সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, মরিশাস এবং সংযুক্ত আরব আমীরশাহীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে, গ্লোবাল বায়োফুয়েল অ্যালায়েন্স-এর সূচনা করেন। জৈব জ্বালানী আমাদের অর্থনীতির জন্য খুবই ভাল কেননা এতে বিদেশ থেকে আমদানি করা অপরিশোধিত তেলের উপর আমাদের নির্ভরতা কমাবে এবং পরিবেশ রক্ষায় এর উপযোগিতা অকল্পনীয়। আমরা এখন ব্রাজিলের সভাপতিত্বে পরবর্তী জি২০ সম্মেলনের অপেক্ষায় আছি যেখানে 'গ্লোবাল সাউথ' কণ্ঠস্বর হিসাবে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে জি২০ troika-তে অংশগ্রহণ করবে। জি২০ সভাপতিত্বের পূর্বতন, আগামী এবং বর্তমান দেশের সম্মিলিত গ্রুপকে troika বলা হয় যারা প্রথানুযায়ী সমর্থন জানাবে বর্তমান জি২০ ব্রাজিল প্রেসিডেন্সিকে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে দশম থেকে পঞ্চম স্থানে ভারতকে নিয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পঞ্চম থেকে তৃতীয় স্থানে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারত মাথা তুলে দাঁড়াবে, নরেন্দ্র মোদীর সময়কালেই। এই ইতিহাস নির্মাণ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ছবিতে খবর

বিজেপি কলকাতা দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার বুথ সশক্তিকরণের বৈঠকে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উত্তর দিনাজপুর সাংগঠনিক জেলার ইটাহার বিধানসভার কার্যকর্তাদের নিয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

বিজেপি তমলুক সাংগঠনিক জেলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্বাচিত বিরোধী পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার বুথ সশক্তিকরণের বৈঠকে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

কাঁথি সাংগঠনিক জেলায় "লোকসভা প্রবাস যোজনা" কার্যক্রমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী সহ বিজেপি বিধায়কগণ এবং কর্মীবৃন্দ।

কামদুনির ধর্ষকরা তৃণমূলের সাথে যুক্ত, তাই তাদেরকে বাঁচাতে রাজ্য পুলিশ উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ কোর্টের কাছে আড়াল করেছে, তারই প্রতিবাদে কামদুনির নির্যাতিতার পরিবারের পাশে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

ছবিতে খবর

দার্জিলিং জেলায় বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা।

ছবিতে খবর

ভারত সরকারের "আমার মাটি আমার দেশ" কার্যক্রমে তৃণমূলের দলদাস পুলিশের বাঁধা দেওয়ার বিরুদ্ধে বিজেপির ধিক্কার মিছিল।

কলকাতার সল্টলেক অফিসে সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

স্বরুপনগর বিধানসভার মালঙ্গপাড়ায় দরিদ্র ও মুমূর্ষ রোগীদের সহযোগিতার জন্যে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাংসদ শ্রী শান্তনু ঠাকুর।

ধূপগুড়ি বিধানসভার গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করলো বিজেপি। সকলকে অভিনন্দন!

কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার কাটোয়া শহর মন্ডলের স্টেডিয়াম পাড়া এলাকায় গৃহ সম্পর্ক অভিযানে রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার সহ জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

কলকাতার EZCC-তে রোজগার মেলায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার। এই রোজগার মেলার মাধ্যমে বাংলার ৫১ হাজার যুবককে চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে।

ছবিতে খবর

বনগাঁ সংগঠনিক জেলার গাইঘাটা বিধানসভার ঠাকুরনগরের শিমূলপুর মানিকহীরা গ্রামে বিজেপি বুথ সভাপতির মাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা খুনীদের শাস্তির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার ও নেতৃবৃন্দ।

ছবিতে খবর

মাদারিহাট বিধানসভার বীরপাড়া ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে এলো। সকলকে অভিনন্দন।

মাদারিহাট বিধানসভার ৩ নং মন্ডলের অন্তর্গত পশ্চিম খয়েরবাড়ি পন্ডিত পাড়া গৃহ সম্পর্ক অভিযানে জেলা বিজেপি সভাপতি শ্রী মনোজ টিগ্গা ও সকল নেতৃত্ব।

কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের চিলকিরহাট অঞ্চলে বস্তি সম্পর্ক অভিযানের মাধ্যমে এলাকার মানুষের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ শুনলেন বিধায়ক শ্রী নিখিল রঞ্জন দে।

কামদুনির কাণ্ডে রাজ্য সরকারের ভূমিকার প্রতিবাদে বাঁকুড়ায় বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা এবং জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ববিতা ব্যানার্জী।

তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি ও চুরির বিরুদ্ধে 'নবান্ন চলো' অভিযানের সমর্থনে নদীয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলায় জনসভায় রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি জগন্নাথ সরকার।

পাতাল চণ্ডী কল্যাণ সমিতির আয়োজনে মালদার ইংলিশবাজারে বন্যায় আক্রান্ত মানুষজনকে ত্রিপল, জামাকাপড় হাতে তুলে দিলেন বিজেপি বিধায়ক শ্রীরুপা মিত্র চৌধুরী।

ছবিতে খবর

বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মেদিনীপুর জোনাল ইলেকট্রিক অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে জেলা সভাপতি শ্রী সুদাম পন্ডিত, জেলা যুবমোর্চার সভাপতি শ্রী আশির্বাদ ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

ডায়মন্ড হারবার বিধানসভায় রামকৃষ্ণ মিশন সরিষার মন্দির প্রাঙ্গনে "আমার মাটি আমার দেশ" মাটি সংগ্রহ কার্যক্রমে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা অগ্নিমিত্রা পল ও জেলা সভাপতি অভিজিৎ সরদার।

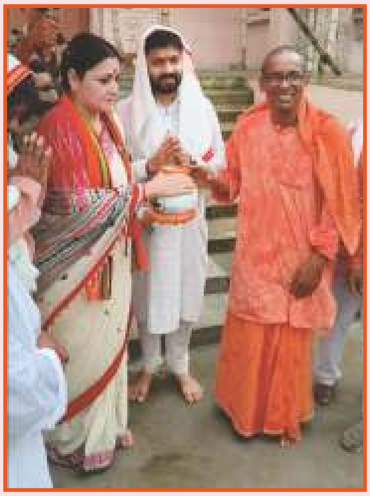

বারাসাত জেলার (বিজেপি সাংগঠনিক) মধ্যমগ্রাম বিধানসভায় ইছাপুর নীলগঞ্জের পাঁচঘড়া গ্রাম। তৃনমূলের উন্নয়নের ঠ্যালায় মুখ থুবড়ে পড়েছে প্রতিদিনের জীবনযাপন। রাস্তার এই বেহাল দশার বিরুদ্ধে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবে এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব।

করোনা অতিমারীর পর দীর্ঘ সময় বাদে আবারও বরাভূম স্টেশনে স্টপেজ দেবে টাটানগর - আরা এক্সপ্রেস (ট্রেন নং -১৮১৮৩/৮৪) ও টাটানগর - কাটিহার এক্সপ্রেস (২৮১৮১/৮২)। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাত।

এইবার, সত্যিই একশো পার হবে

অভিরূপ ঘোষ

ভারতের এই সোনার এশিয়ান গেমসেও প্রতিবাদী বজরং পুনিয়া গোল্লা পেল। বজরং প্রমাণ করল দেশকে অপমান করে হয়তো সংবাদপত্রের হেডলাইনে আসা যায় কিন্তু সোনা জেতা যায়না। ভারতের রাষ্ট্রপ্রেমী খেলোয়াড়েরা সফল করেছে ভারতের 'এইবার, ১০০ পার' এশিয়াডের স্লোগান। ব্যাক্তিগত স্কিল সাফল্য দেয় বটে কিন্তু দেশকে ভাল না বাসলে নিজেকে উজাড় করে দেওয়া যায়না, নিজের ক্ষমতাকে ছাপিয়ে যাওয়া যায়না, সেরার সেরা হয়ে দেশকে গর্বিত করা যায়না। দেশের এই সোনার সময়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে আমাদের রাজ্যের ক্রীড়াবিদরা। মমতা ব্যানার্জি ব্যাস্ত মাদ্রিদের স্পোর্টস ট্যুরিজমে।

দেশের প্রথম সারির এক মিডিয়া হাউসের অনলাইন পেজের হেডলাইন এটা। অবশ্যই শুধু একটা নয়, গোটা দেশের সমস্ত ইলেকট্রনিক এবং ডিজিটাল মিডিয়ায় ৬ তারিখ বিকেলের হেডলাইন স্টোরি মোটামুটি ওটাই। কিন্তু এমনটা তো হবার কথা ছিল না! যে ছেলেটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে মোট চারটে মেডেল পেয়েছে, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে আটটা, কমনওয়েলথ গেমসে তিনটে মেডেল পেয়েছে, এমনকি শেষ এশিয়ান গেমসের সোনাটাও যার নামে সে এইভাবে হেরে যাবে এটা আজ থেকে এক বছর আগেও ভাবা যাচ্ছিল না। আর শুধু কি হার! বজরং পুনিয়ার ম্যাচে স্কোর লাইন ০-১০। অর্থাৎ এটা শুধু হার নয় - বিপক্ষের কাছে একপ্রকার পর্যুদস্ত হওয়া। অস্বীকার করার উপায় নেই নিজের ৬৫ কেজি বিভাগে বজরং ভারতের সর্বকালের সেরা রেসলারদের মধ্যে একজন। গতবারের মতো এবারও এশিয়ান গেমসের সোনাটা ওর নামেই লেখা ছিল, যদি না রাজনীতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে প্র্যাক্টিস আর দেশের সম্মান ছেড়ে রাস্তার নাটুকে প্রতিবাদে নাম লেখাত বজরং।

বজরং পুনিয়ার সাথে সরকারবিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিল কেউ কেউ। মিডিয়া বলেছিল এটা কুস্তিগীরদের 'সামগ্রিক' প্রতিবাদ। বাস্তব সত্য হল যে ১৮ জন খেলোয়াড় কুস্তিতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে (সরকারের বদান্যতায় নয়, রীতিমতো ট্রায়ালে জিতে) এবার তাদের মধ্যে মাত্র একজনই প্রতিবাদীদের দলে ছিল এবং সেও শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়ে এসেছে। আরও ইন্টারেস্টিং তথ্য হল ১৮ জনের মধ্যে শুধুমাত্র বজরং পুনিয়া কোনরকম ট্রায়াল না দিয়েই

সরাসরি এশিয়ান গেমসে অংশ নিয়েছিল। তার ৬৫ কেজি বিভাগে ট্রায়ালে জেতা বিশাল কাদিয়ান, যে কিনা এই মুহূর্তে সোনা জেতার মত পরিস্থিতিতে ছিল তাকে রিজার্ভে রাখা হয় ফেডারেশনের কিছু লবিবাজ কর্তাব্যক্তির চাপে। আসলে আম আদমি পার্টি, কংগ্রেস এবং রাকেশ টিকাইতদের মত কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের সমর্থনে আন্দোলন করে সরকারের বিরুদ্ধে একটা চাপ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা ছিল তাদের। যাতে করে অলিম্পিকে সরাসরি কোটা দিয়ে দেওয়া হয় তাদেরকে। নিয়ম অনুযায়ী কুস্তির একটা বিভাগে মাত্র একজন প্রতিযোগী দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এশিয়ান গেমস বা অলিম্পিকে। সরকারকে চাপ দিয়ে অনৈতিকভাবে সেই কোটাটাই দখল করা ছিল কুস্তিগীরদের তথাকথিত নাটুকে আন্দোলনের পিছনে আসল কারণ। বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে একমাত্র বজরংয়ের এশিয়ান গেমসে যাওয়া এবং পর্যুদস্ত হয়ে দেশে ফেরা বুঝিয়ে দেয় বর্তমান ফর্মের বিচারে ভারতের প্রথম সারির কোন কুস্তিগীরই সরকার বিরোধী আন্দোলনে শামিল ছিল না। সৌভাগ্য ভারতের যে খেলোয়াড়দের

অগ্নিকন্যা তিতাস সাধু।

মধ্যে বজরং ব্যতিক্রম।

'এইবার, ১০০ পার' ছিল এবারের এশিয়াডের স্লোগান। অনেকেই ভেবেছিল এটা জাস্ট কথার কথা। একশোটা মেডেল পাওয়া ভারতের কাছে কোনো স্বপ্নের চেয়ে কম ছিল না। গতবার ২০১৮ সালে ভারত মোট ৭০টা মেডেল (যা তৎকালীন সময় অবধি ভারতের সেরা ট্যালি) পেয়েছিল যা আপাতদৃষ্টিতে খুব বড় প্রাপ্তি হিসেবেই ভাবা হচ্ছিল। এবারে বেশ কিছু ইভেন্ট বাদ যাওয়াতে এবং ভারতের ফেভারিট কিছু ইভেন্টে পদক সংখ্যা কমে যাওয়াতে সাধারণ ক্রীড়াপ্রেমীরা ভেবেছিল গতবারের মতো পারফরম্যান্স করতে পারলে সেটাই অনেক। সেখানে ১০০টা মেডেলকে অনেকেই অসম্ভব হিসাবে ভাবতে শুরু করেছিল। সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখালেন ভারতের রাষ্ট্রপ্রেমী খেলোয়াড়েরা। গতবার যেখানে ষোলটা সোনা সমেত ৭০টা মেডেল পেয়েছিল দেশ এবারে সেখানে আটাশটা সোনার সাথে মোট ১০৭টা মেডেল পাওয়ার অনন্য রেকর্ড স্থাপন করে ফেলেছে রাষ্ট্র ভারত।

কারুর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যেখানে মোট পদক সংখ্যা ১০৭ সেখানে গোল্ড মেডেল ২৮ কেন! যেখানে ভারত ৩৮ টা রুপোর পদক এবং ৪১ টা ব্রোঞ্জের পদক পেয়েছে সেখানে গোল্ড মেডেলের সংখ্যাটা আনুপাতিক হিসেবে কম কেন! এর উত্তর লুকিয়ে আছে এক অনৈতিক লড়াইয়ের গা জোয়ারি মানসিকতায়। সেটাও দু'তরফ থেকে।

প্রথম পক্ষ কাতার-বাহরিনের মত মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ। বাহরিন এবারে অ্যাথলেটিক্সে মোট দশটা সোনা পেয়েছে। এর দশটার মধ্যে সাতটা ক্ষেত্রে রুপো এসেছে ভারতের ঝুলিতে। এই সাতটা কেসেই বাহরিনের যে খেলোয়াড় সোনা পেয়েছে সে আদতে আফ্রিকার কোনো এক দেশের বাসিন্দা। বাহরিন চাকরির লোভ দেখিয়ে নিজেদের দেশের নাগরিকত্ব দিয়ে তাদেরকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছে অনৈতিকভাবে। ভুলে গেলে চলবে না এটা এশিয়ান গেমস। শুধুমাত্র এশিয়ার খেলোয়াড়রাই এই খেলায় অংশ নিতে পারে। তা সত্ত্বেও আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে টাকার জোরে ভারতের অন্তত সাতটা সোনা কেড়ে নিয়েছে বাহরিন। আবার বাহরিনের এই দশটা সোনা

সুতীর্থা ও আহিকা-র জন্য গর্বিত ভারত।

সমেত সতেরোটা পদকের (অ্যাথলেটিক্সে) ক্ষেত্রে ভারতের অন্তত চারজন চার নম্বরে শেষ করেছে। আফ্রিকান অ্যাথলেটিকদের এভাবে না খেলালে শুধু এই ক্ষেত্রেই ভারতের পদক সংখ্যা আরো চার বাড়তো। সাথে অবশ্যই গোল্ড মেডেল বাড়তো আরো সাত। একইভাবে কাতারের হয়ে খেলা চারজন আফ্রিকাজাত অ্যাথলিটের জন্য ভারতের ঝুলিতে দুটো রুপো এবং একটা সোনার পদক কম এসেছে।

ভারতের দিকে দ্বিতীয় ধাক্কা এসেছে আয়োজক চীনের তরফ থেকে। প্রথমেই ভারতের অরুণাচল প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিত্ব করা তিনজন খেলোয়াড়কে ভিসা না দিয়ে চীন বুঝিয়ে দেয় তারা নিজেদের ক্ষমতার অন্যায় ব্যবহার পূর্ণরূপে করতে চলেছে। ভারতের ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর এই ঘটনার প্রতিবাদে নিজের চিন সফর বাতিল করেন। কিন্তু তাতেও দমানো যায়নি ড্রাগনের দেশকে। কখনো শেষ মুহূর্তে নিয়ম বদলে ভারতীয় শুটিং দলকে খেলতে না দেওয়া, কখনো অন্যায় ভাবে লাল কার্ড দেখিয়ে ভারতের খেলোয়াড়কে বাতিল করে দেওয়া আবার কখনো লাজলজ্জার মাথা খেয়ে নীরজ চোপড়ার সেরা থ্রো টাই

না মাপা চীনের কাছে স্বাভাবিক বিষয় হয়ে গিয়েছিল। উশু আর বক্সিংয়ের ৭৫ কেজি বিভাগের ফাইনালে জোর করে ভারতীয় খেলোয়াড়দের হারিয়ে নিজের দেশে সোনা নিয়ে আসাটা সেখানে চীনের কাছে জলভাত হয়ে গিয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে শুধুমাত্র চীনের নোংরামিতেই ভারতের তিনটে সোনার পদক সমেত সাতটা পদক কমে গেছে এবারে।

এত বাধা সত্ত্বেও ভারতকে আটকানো যায়নি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো থেকে। তার প্রথম কারণ ভারতীয় খেলোয়াড়দের হার না মানা মানসিকতা হলে দ্বিতীয় কারণ অবশ্যই ক্রীড়াক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া। ক্ষমতায় এসেই বর্তমান সরকার বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনটে ক্ষেত্রে ভাগ করে ফেলে গোটা বিষয়টাকে। প্রথম ক্ষেত্রে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে খেলোয়াড় তুলে আনার জন্য স্কুল- কলেজ বা ব্লকস্তরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা স্টেট- ন্যাশনাল লেভেলে খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ আর শেষ ক্ষেত্রে টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়ামের মত প্রিমিয়াম ইন্টারন্যাশনাল লেভেল স্কিম।

বর্তমানে টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম বা টপসে নীরজ চোপড়া, অবিনাশ সাবলে, পারুল চৌধুরী, পিভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেন, চিরাগ-স্বাত্বিক বা মহম্মদ আনাস ইয়াহিয়ার মত মোট ৭০ জন খেলোয়াড়ের নাম অন্তর্ভুক্ত আছে। এদের ডায়েট, স্পেশাল কোচ থেকে আরম্ভ করে বিদেশে ট্রেনিং পর্যন্ত সবকিছুর ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করে। এছাড়াও তাদের জন্য বড়সড়ো আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থাও কেন্দ্র করেছে। পরিসংখ্যান বলছে এই ৭০ জন ক্রীড়াবিদ এবারের এশিয়াডে ৫৮ টা মেডেল আনতে সক্ষম হয়েছে। যারা পারেনি তাদের মধ্যে ন'জন এবারে চোটের জন্য অংশগ্রহণই করতে পারেনি। অর্থাৎ টপ স্কিমকে অবিশ্বাস্যভাবে সফল হতে দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই। যদিও আমাদের মাথায় রাখতে হবে টপ স্কিমের প্রকৃত লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদি - ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক এবং ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক। এই ৭০ জনের মধ্যে শেষ কমনওয়েলথের ৪৯ আর এবারের ৫৮টা মেডেলকে তাই টপসের উপরি পাওনা হিসেবেই ভাবতে হবে। এর সাথে যুক্ত হবে 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রোগ্রাম। টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিমে আপাতত যুক্ত নয় এমন অনেক প্রতিশ্রুতিমান খেলোয়াড়ই উঠে এসেছে খেলো ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে। এই প্রোগ্রামে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার(সাই) তত্ত্বাবধানে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্নক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিমান উঠতি ক্রীড়াবিদকে নির্বাচন করা হয়। আর তারপর সাই, ভারতের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমিতে বা অন্যত্র তাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে সরকার। ফলাফল সবার সামনে।

এশিয়ান গেমসের এই অভূতপূর্ব সাফল্য অবশ্যই শুধু এবং শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নয়। কেন্দ্রের কৃতিত্ব এখানে সেভেন্টি পারসেন্ট হলে রাজ্যগুলোর কৃতিত্ব কম করে কুড়ি শতাংশ। বাকি ১০% নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে। এবং থাকবেও। তার উত্তর মিলবে কেরালা-পশ্চিমবঙ্গের মত কিছু রাজ্যেই।

নীরজ চোপড়া ও কিশোর জেনা।

কলকাতা থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে এক ছোট্ট শহর নৈহাটি। সেখানেই কোচ সৌম্যদীপ রায়ের অধীনে প্র্যাকটিস করে সুতীর্থা মুখার্জি এবং আহিকা মুখার্জি। ওরা দু'জনে এবারে এশিয়ান গেমস টেবিল টেনিসে ব্রোঞ্জ পেয়েছে। ডাবলসে। এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকারের থেকে যথাযথ সাহায্য পায়নি ওরা। মাথায় রাখতে হবে এশিয়ান গেমসের টেবিল টেনিস অলিম্পিক মানের আর চীন-কোরিয়া-জাপানের মত দেশগুলোর দাপটে ভারত এবারের আগে পর্যন্ত টেবিল টেনিস ডাবলসে কোন মেডেল পায়নি। দুর্ভাগ্যের কথা এই ঐতিহাসিক সাফল্যের পরেও রাজ্য সরকারের ওদের নিয়ে কোন হেলদোল নেই। পাশের রাজ্যে যখন সিলভার মেডেলিস্ট কিশোর কুমার জেনাকে দেড় কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করছে ওড়িশা সরকার, সেখানে বাংলার মেয়েদের কপালে এখনও কানাকড়ি কিচ্ছু জোটেনি। রাজ্য বছরের পর বছর ভোট কিনতে ক্লাবগুলোকে টাকা বিলিয়েছে অকাতরে। কিন্তু কয়েকশো কোটির এই বিশাল অঙ্কের বিন্দুমাত্রও সুতীর্থাদের কপালে জোটেনি। একই অবস্থা মহিলা ক্রিকেটে সোনাজয়ী রিচা ঘোষ বা তিতাস সাধুর। বাংলার মেয়েদের কথা বলার ভণিতা করা রাজ্যের 'মহিলা' মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর কোন প্রতিনিধি রাজ্যের মেয়েগুলোর এই সাফল্যকে কোনোরকম কৃতিত্ব দিয়েছেন বলে জানা যায় না। অবশ্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর থেকে এরকম কিছু প্রত্যাশা করাটাই ভুল। এরা না হয় আন্তর্জাতিক স্তরে এই প্রথমবার সাফল্য পেল (রিচা আগেও পেয়েছে, অন্যক্ষেত্রে)। কিন্তু বছরের পর বছর রাজ্য তথা দেশের নাম উজ্জ্বল করা বরানগরের ছেলে অতনু দাস, যে কিনা এবারেও সিলভার মেডেল পেয়েছে তীরন্দাজিতে, রাজ্য সরকারের থেকে বিশেষ কিছু সাহায্য পেয়েছে বলে শোনা যায় না। ওহ হ্যাঁ, অতনু কেন্দ্রের টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিমের এক নম্বর নাম। হয়তো সেজন্যেই আন্তর্জাতিক স্তরে এখনো নিজের সুনাম বজায় রাখতে পেরেছে। নয়তো রাজ্যের ভরসা করে অনেক অনেক ক্রীড়াবিদ আগেই হারিয়ে গেছে অতীতের কালস্রোতে। গতবারের এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী স্বপ্না বর্মন বা এবারের জিমন্যাস্ট ফেবারিট প্রনতি নায়েক যে পদক ছাড়াই রাজ্যে ফিরছে তার জন্য রাজ্যের বঞ্চনা এবং কেন্দ্রের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর অসহযোগিতার মানসিকতাই মুখ্যত দায়ী। হয়তো তাই ভারতের স্কোয়াশ লেজেন্ড সৌরভ ঘোষাল বা বিখ্যাত ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহা রাজ্য ছেড়েছে আগেই।

মোদ্দা কথা দেশ এগোচ্ছে আর রাজ্য পিছোচ্ছে, একসাথে।

খালিস্তানি আন্দোলন এক ঝলকে

সৌভিক দত্ত

শিখ মানেই দেশদ্রোহী, বিচ্ছিনতাবাদী খালিস্তানি জঙ্গি নয়। শিখ মানেই খালিস্তানিদের পিছন থেকে সমর্থন দেওয়া আইএসআই-এর দালাল নয়। কেন শিখরা দূরে সরে গিয়েছিল হিন্দুদের থেকে? কি ভূমিকা ছিল দয়ানন্দ সরস্বতী এবং ব্রিটিশ শাসকের? কার ভুলে পঞ্জাবে জ্বলে উঠেছিল বিচ্ছিনতাবাদের আগুন! নেহরু? ইন্দিরা? সঞ্জয়? রাজীব? -সবার ভুল ছিল। গান্ধী পরিবারের সেই ভুলের মাশুল আমাদের আজও গুনতে হচ্ছে। যদিও খালিস্তানিদের বস্তাপচা বিপ্লবের তত্ত্ব, মুখ থুবড়ে পড়ল বলে।

হঠাৎ করেই ভারত যেন দ্বিতীয় ইজরায়েল হয়ে উঠলো। ভারতের এজেন্সি হয়ে উঠলো দ্বিতীয় মোসাদ। বিদেশের মাটিতে একের পর এক পড়তে লাগল দেশদ্রোহী জঙ্গিদের লাশ! পাকিস্তান - ইংল্যান্ড বা কানাডা, কোথাও দেশদ্রোহীরা মৃত্যুর থাবা থেকে লুকিয়ে বাঁচতে পারছেনা। জাতীয় তো বটেই, আন্তর্জাতিক মহলও বেশ নড়েচড়ে বসল এইভাবে ভারতের হঠাৎ অভ্যুত্থানে। আর তারই সাথে সবার মুখে মুখে আলোচনার হট টপিক হয়ে দাঁড়াল একটা শব্দ - খালিস্তান।

তা কি এই খালিস্তান? সোজা ভাষায় বলতে গেলে 'পাকিস্তান'। বাংলাদেশের পর ভারতের বুক চিরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে নতুন একটা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রধর্ম হবে শিখধর্ম। যদিও প্রস্তাবিত খালিস্তানের মানচিত্রে শুধু ভারত ভাগের কথা নেই, আছে পাকিস্তান থেকে কিছু অংশ নেওয়ার কথাও, এমনকি প্রস্তাবিত খালিস্তানের রাজধানী হওয়ার কথা পাকিস্তান অধিকৃত লাহোরেই। তবু কোনো এক অজ্ঞাত রাজনৈতিক সমীকরণে খালিস্তানিদের যত বিক্ষোভ - আন্দোলন - জঙ্গি যুদ্ধ সবই ভারতের বিরুদ্ধেই! পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের তো কোনো আন্দোলন তো নেইই, বরং পাকিস্তান থেকেই তাঁরা সাহায্য পায় খালিস্তানি সন্ত্রাস চালানোর জন্যে। এমনকি হরমিত সিং হ্যাপি নামে পাকিস্তানে আশ্রয় পাওয়া এক খালিস্তানিকে যখন বছর ৩ আগে পাকিস্তানের মাটিতেই ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়, তখন পাক সরকার সে ঘটনাকে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের কাজ বলে জানালেও আন্তর্জাতিক মহলের নজর ছিল দ্বিতীয় মোসাদের দিকই। ঐতিহাসিকভাবেই যে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে শিখদের বিনির্মাণ, পূর্বপুরুষদের আত্মবলিদানকে উপেক্ষা করে সেই তাদেরই সাথে হাত মেলাতে ন্যূনতম লজ্জা হয়না খালিস্তানিদের।

অবশ্য খালিস্তানি আন্দোলনকে বুঝতে হলে যেতে হবে আরেকটু পেছনে! সুদূর উজবেকিস্তান থেকে উড়ে এসে, থুরি আক্রমণ করে ভারতে আসা মোগল ঔপনিবেশিক সময়ে। বর্তমান সময়ে ভারতীয় ধারণা "ধর্ম" আর আব্রাহামিক ধারণা "religion"-কে যেমন আমরা একাকার করে দিই, ভারতে আগে তেমন ছিলনা। ধর্ম বলতে বোঝাত যে সব নীতিমালা সমাজকে ধারণ করে (√ধৃ>ধর্ম)! আর ছিল গুরুবাদী পন্থা- বৌদ্ধপন্থা, জৈনপন্থা, কবীরপন্থা ইত্যাদি ইত্যাদি! তেমনই এক পন্থা হিসেবে নানকপন্থার উত্থান।

গুরু নানক নিজে ক্ষত্রিয় ছিলেন। তৎকালীন অনেক ভক্তিবাদী সাধকের মতো হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ঘোচানোর লক্ষ্যে তাঁর বাণী ছিল, "কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলমান নয়।" তাঁর সহজ উপদেশ ছিল, "কর্ত করো, নাম জপো, ওয়ান্দ করো" (কাজ করো, ঈশ্বরের নাম নাও আর নিজের আয় ভাগ করে নাও)। পরবর্তী গুরুদের আমলে ধীরে ধীরে শিখরা বাকি হিন্দুদের থেকে ভিন্ন পরিচয় পেতে শুরু করে। যেমন গুরু অমরদাস পর্দা প্রথা, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি বন্ধ করেন। বিধবা বিবাহ এবং আন্তঃবর্ণ বিবাহের প্রচলন করেন। অন্য হিন্দুদের কাছে অতটা আধুনিকতা তখন দূর অস্ত ছিল। এরপর গুরু অর্জুনের সময় শিখদের নিজস্ব তীর্থস্থান অমৃতসর স্বর্ণমন্দির তৈরি হয়। তার আগে শিখেরাও হরিদ্বার বা বারাণসীতে তীর্থ করতে যেতেন। গুরু তেগ

বাহাদুরের হত্যার কারণও ছিল হিন্দুদের জোর করে ইসলামে ধর্মান্তকরণের প্রতিবাদ করা। শোনা যায় রঞ্জিত সিং, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে কোহিনূর দান করতে চেয়েছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে যায় ব্রিটিশ আমলে। Divide and Rule নীতি অনুসারে ব্রিটিশরা সনাতন ধর্মের থেকে বৌদ্ধ, জৈন, শিখদের আলাদা করতে শুরু করে। এমনকি বর্ণহিন্দু ও দলিত বিভাজনও করতে উদ্যত হয়েছিল, সম্ভব হয়নি গান্ধী আর আম্বেদকরের সদিচ্ছার কারণে (পুণা চুক্তি)। যাইহোক, যেখানে ছিলাম সেখানে ফিরি।

পঞ্জাব দখলের পরে ব্রিটিশরা বুঝতে পারে যে নানকপন্থীদের মধ্যে ঐতিহাসিক কারণেই একটা যোদ্ধা মানসিকতা কাজ করছে। তাই তাঁরা শিখ জমিদার এবং স্থানীয় শাসকদের সুযোগ সুবিধা দিতে শুরু করে এবং সেনাবাহিনীতে শিখদের জন্য আলাদা রেজিমেন্ট খোলে। এইভাবে সরকারিভাবে শিখদের আলাদা করার প্রক্রিয়া চালু হয়। আর এই প্রক্রিয়া গতি পায় দয়ানন্দ সরস্বতীর এক ভুলে। শুদ্ধি আন্দোলনের সময় অযথাই তিনি গুরু নানককে একজন ভণ্ড এবং গ্রন্থসাহেবকে একটি পরিত্যাজ্য গ্রন্থ হিসেবে প্রচার করেন। এটা ছিল একটা চরম নির্বুদ্ধিতা! এতে করে শিখদেরই দূরে ঠেলে দেওয়া হল। আর সেই সুযোগ নেয় ব্রিটিশরা। এম এ ম্যাকলিফ ছয় খণ্ডে 'হিস্ট্রি অফ শিখ রিলিজিয়ন 'প্রকাশ করে। অর্থাৎ ব্রিটিশরা মান্যতা দিল শিখেরা সম্পূর্ণ অন্য ধর্মসম্প্রদায়। কাহান সিংও একটি পুস্তিকা লিখে প্রচার করেন, "হাম হিন্দু নেহি"।

ব্যস, ষোলোকলা প্রায় পূর্ণ হল। আর বিভাজনের যেটুকু বাকি ছিল তা পূর্ণ হল ১৯২৫ সালে। এই সময় শিখ গুরদোয়ারা অ্যাক্ট পাশ করা হয় এবং গুরদোয়ারাগুলির দায়িত্ব "শিরোমণি গুরদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটি" (SGPC)-কে দেওয়া হয়। এর আগে পর্যন্ত এই দায়িত্ব ছিল হিন্দু মহন্তদের। আর এই বিভাজনের পেছনে মূল ইন্ধন ছিল আকালি আন্দোলনের!

এরপর দেশভাগের সময় মুসলমানদের হাতে একসাথে মার খেয়ে হিন্দু আর শিখের বিভাজন অনেকটাই কমে আসে। তাঁরা আবার কাছাকাছি আসে, একত্রে প্রতিরোধ করে জেহাদি সন্ত্রাসের! কিন্তু তা ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী! রাজ্য পুনর্গঠনের সময় পাঞ্জাবি ভাষাভাষীদের জন্য কোনো আলাদা রাজ্য দেওয়া হয়নি। ফলে শিখরা নিজেদের বঞ্চিত মনে করতে থাকে। নেহরু সরকারের এই ভুলে যে হিন্দু-শিখ বিভেদ দেশভাগের ফলে কমে এসেছিল, তা আবার মাথাচাড়া দেয়। যদিও '৪৭-এই আকালি দল পৃথক রাষ্ট্রের দাবি জানিয়েছিল, তবে কেউই তাদের তেমন গুরুত্ব দেয়নি।

পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে অনেক দেরি করে হলেও তৈরি হয় পঞ্জাব রাজ্য। তবে চণ্ডীগড় কার দখলে থাকবে তা নিয়ে টানাপোড়েন চলতে থাকে। তার উপর সবুজ বিপ্লবের সময় হঠাৎ করে হাতে অত্যধিক টাকা চলে আসায় শিখ যুবকেরা বিদেশে পাড়ি দিতে শুরু করে। স্থানীয় শ্রমচাহিদা মেটানোর জন্য বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে অনেক দিনমজুর এসে পঞ্জাবে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করে এবং স্থানীয় ভোটার লিস্টে নাম তোলে। এর ফলে শিখরা নিজেদের রাজ্যেই সংখ্যায় কমে যেতে শুরু করে। এছাড়াও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে শিখদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। প্রচুর শিক্ষিত শিখ যুবক তৈরি হয়। কিন্তু পঞ্জাবে তখনো ভারী শিল্প তৈরি না হওয়াতে তাঁরা তাদের চাহিদামতো চাকরি পায়নি। ফলে পাঞ্জাব জুড়ে বেকারত্ব এবং তা নিয়ে অসন্তোষ বেড়ে চলতে থাকে।

এই পরিস্থিতিরই সুযোগ লুফে নেয় অকালি দল। ১৯৭৩ সালে খালসা মতাদর্শের জন্মস্থান আনন্দপুর সাহিবে দলের নেতাঁরা একত্রিত হন এবং 'আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাবনা'র ঘোষণা দেন। এই প্রস্তাবে কিছু দিক ছিল খালিস্তান প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ। অন্যান্য প্রদেশের বেশ কিছু অংশ নিয়ে গঠিত একটি প্রদেশ গঠন এবং সেই প্রদেশের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলে তাঁরা। এছাড়া তাঁরা নতুন প্রদেশের স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থার জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের দাবি জানায় সেই প্রস্তাবে। হতাশাগ্রস্ত ও ভীত শিখরা অনেকেই সমর্থন জানায় এই দলকে।

শিখ গণহত্যা, দিল্লি, ১৯৮৪

আর অকালি দলের এই উত্থানে ভয় পেয়ে যায় কংগ্রেস পার্টি। তাঁরা এর ফলে পাঞ্জাবে কংগ্রেসের মুছে যাওয়ার ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। এছাড়াও এমারজেন্সির সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধিতা করেও কংগ্রেসের বিরাগভাজন হয় অকালি দল। ফলে খোঁজ চলতে থাকে নতুন কোনো শিখ নেতার, যে কংগ্রেসের পুতুল হয়ে অকালি দলের জনপ্রিয়তায় ভাগ বসাবে। আর এই খোঁজের ফলেই উঠে আসে জার্নেল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের নাম। শোনা যায় যে এই সময় নাকি বেশ কয়েকজন উঠতি শিখ নেতার রীতিমতো ইন্টারভিউ নিয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর স্নেহের পুত্র সঞ্জয় গান্ধী। তাদের মধ্যে থেকেই

ফার্স্ট বয় হয়ে বেরিয়ে এসে দায়িত্ব পায় ভিন্দ্রানওয়ালে। ১৯৮০ এর নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়ে প্রচার চালায় ভিন্দ্রানওয়ালে। বদলে কংগ্রেস তার সব মৌলবাদী কাজকর্মে সায় দিয়ে যেতে থাকে। তবে নিজের ব্যক্তিত্বে উঠে আসা ভিন্দ্রানওয়ালেকে চিনতে যথেষ্ট ভুল হয়েছিল মায়ের আঁচলের তলায় বসে ছড়ি ঘোরানো সঞ্জয় গান্ধীর! কারও হাতের পুতুল হয়ে থাকার পাত্র ছিল না ভিন্দ্রানওয়ালে। ফলে খুব তাড়াতাড়িই কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে তাঁর এবং সখ্যতা তৈরি হয় অকালি দলের সাথে। তখন পাঞ্জাবের অকালি দলের প্রধান হরচাঁদ সিং লোঙ্গোয়াল 'ধর্মযুদ্ধ মোর্চা' গঠন করলে ভিন্দ্রানওয়ালে তাতে সমর্থন দিল।

১৯৮২ সালে অকালি দলের সমর্থনে ভিন্দ্রানওয়ালে একটি আইন অমান্য আন্দোলন করে। সে নিজে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে আশ্রয় নিয়ে কার্যত নানক নিবাসের দখল নিয়ে নেয় এবং সেখান থেকেই পুলিশের সাথে তার অনুসারীদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকে। স্বর্ণমন্দির একরকম দুর্গ হয়ে উঠলো তাদের জন্য। আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাবনায় সমর্থন জানায় ভিন্দ্রানওয়ালে আর ক্রমাগত হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকে। পঞ্জাব জুড়ে হিন্দুদের উপর আক্রমণ শুরু হয়। ১৯৮২ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস পণ্ড করার হুমকি দেওয়া হলে উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়। ১৯৮৩ সালের ২৩ এপ্রিল ডিআইজি এ এস আটওয়াল খুন হন। লোকসভায় জোরালো হয়ে ওঠে ভিন্দ্রানওয়ালেকে গ্রেফতারের দাবি।

এরপর ১৯৮৪ সালে পঞ্জাবের পরিস্থিতি আরও বাজে দিকে মোড় নেয়। ভিন্দ্রানওয়ালে সরাসরিই শিখদের অস্ত্র তুলে নেওয়ার আহ্বান জানায়। পাঞ্জাব জুড়ে যেখানে সেখানে পড়ে থাকতে শুরু করে হিন্দু আর সরকারি কর্মকর্তাদের মৃতদেহ। পাকিস্তানের থেকে প্রচুর অস্ত্র এসে জমা হয় ভিন্দ্রানওয়ালের হাতে। সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স কেজিবি ইন্দিরা গান্ধীকে সতর্ক করে দেয় আরেকটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্যে। আর এরপরেই ইন্দিরা গান্ধী নির্দেশ দেন অপারেশন ব্লু-স্টারের! ১৯৮৪ সালের ১ জুন থেকে ৮ জুন ভারতীয় সেনাবাহিনী 'অপারেশন ব্লু-স্টার' পরিচালনা করে। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখা উচিত। শিখদের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশই ছিল এই খালিস্তানের সমর্থক। বেশিরভাগ শিখেরই এই বিচ্ছিন্নতাবাদী বাতিক ছিল না। এমনকি অপারেশন ব্লু-স্টার পরিচালনা করা লে. জেনারেল কুলদীপ সিং নিজেও একজন শিখ ছিলেন। এমনকি বর্তমানে কানাডাতেও ৯৯% শিখ, খালিস্তানি আন্দোলন সমর্থন করেনা বলে এক সমীক্ষায় জানা গেছে।

যাইহোক, এর কয়েকমাস পরেই শিখ দেহরক্ষীদের গুলিতে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা ঘটে আর কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশজুড়ে শুরু হয় শিখ গণহত্যা। কেবল দিল্লীতেই মৃত্যু হয়েছিল ২১০০ জন শিখের! সব মিলিয়ে নিহত হয় ১৭০০০-এরও বেশি শিখ। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার নিরীহ শিখদের রক্ষা করে রাজধর্ম পালন না করে প্রতিশোধাত্মক মানসিকতা দেখায়। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী

সঞ্জয় গান্ধীর খাস দোস্ত খালিস্তানি নেতা জার্নেল সিং ভিন্দ্রানয়ালে।

নির্লজ্জতার চূড়ায় উঠে এই গণহত্যাকে জাস্টিফাই করে এই বলে যে, "যখন একটি বড় গাছ ভেঙে পড়ে, তখন চারপাশের মাটি কাঁপবেই"! এই গণহত্যার ঘটনা আজও শিখদের মনে হিন্দু বিরোধিতা জাগানোর অন্যতম অস্ত্র।

পরবর্তীতে ভারতের মাটিতে খালিস্তানি আন্দোলন ঝিমিয়ে গেলেও বিদেশ থেকে উস্কানি দেওয়া চলতেই থাকে। কানাডা - ইউকে ইত্যাদি দেশ হয়ে ওঠে প্রবাসী খালিস্তানিদের বড় ঘাঁটি। সেখান থেকেই অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন যোগানোর চেষ্টা চালায় তাঁরা। তবে পঞ্জাবেও যে তাঁরা একেবারে নির্মূল তা বলা যায় না। কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছি কৃষিবিলকে সামনে রেখে কিভাবে পঞ্জাবকে অগ্নিগর্ভ করে দেওয়া হল বা কিভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পঞ্জাবে হত্যার চেষ্টা হল। তবুও বলা যায় যে বর্তমানে খালিস্তানি আন্দোলন যে পর্যায়ে আছে তা কেবলই হিংসাত্মক পরিবেশ তৈরি করা বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বদনাম করার ব্যর্থ চেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ভারতের মতো একটা সুপার পাওয়ার হতে চলা দেশকে ভাগ করা ওই গুটি কয়েক বিচ্ছিন্নতাবাদীর কাজ না। ১৯৪৭ এর ভারত আর ২০২৩ এর ভারতের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

এছাড়াও এর আগে যা ঘটেনি, বর্তমান আমলে তা ঘটছে অর্থাৎ শিখদের জন্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে তাদের কাছে টেনে নেওয়া হচ্ছে। কর্তারপুর করিডোর খুলে দেওয়া হয়েছে। যাতে তাঁরা তাঁদের ধর্মস্থান দরবার সাহিব কর্তারপুর গুরুদোয়ারায় যেতে পারে। কাবুল থেকে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গুরু গ্রন্থ সাহিব। শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের পুত্র বা 'সাহিবজাদে'-দের সাহসকে শ্রদ্ধা জানাতে প্রতি বছর ২৬ ডিসেম্বর 'বীর বাল দিবস' হিসেবে পালন করা হচ্ছে। এমনকি পাকিস্তান - আফগানিস্তানে থাকা শিখদের (এবং অন্যান্য ইন্ডিকদের) ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য CAA আনা হচ্ছে যাতে তাঁদের আর ওইসব দেশে কাফেরের জীবন না কাটাতে হয়।

আশা করা যায় প্রধানমন্ত্রীর এইসব সদিচ্ছামূলক পদক্ষেপের ফলে এবং বিদেশের মাটিতে এজেন্সিদের কার্যক্রমের ফলে খুব শিগগিরই ইতিহাসের ডাস্টবিনে পুরোপুরিভাবে চলে যাবে খালিস্তানি আন্দোলন! কাশ্মীর হোক বা নর্থ ইস্ট হোক কিংবা পঞ্জাব হোক, ভারত ভাঙার চক্রান্ত কোনোদিনই সফল হবেনা।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সেক্যুলার' ও সোশ্যালিস্ট' শব্দবন্ধ— ইতিহাস ও রাজনীতি

আবীর রায় গাঙ্গুলী

যে দেশে হাজার বছর ধরে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা তুলসী তলায় ধূপ-ধুনো দিয়ে শাঁখ বাজে, যে দেশে এখনও প্রতি শনিবারে রাস্তায় রাস্তায় শনিমন্দিরে উপচে পড়ে ভিড়, যে দেশে বারণ না করলেও চটি না খুলে কেউ মন্দিরে ঢোকেনা, যে দেশে কমিউনিস্টরাও মহা অষ্টমীতে পুষ্পাঞ্জলি দেন, যে দেশে ধর্মের ভিত্তি অটল কর্তব্যবোধ, আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে মুক্তির সংকল্প, এবং ব্রহ্মলাভ - সে দেশে ধর্ম কি কখনও নিরপেক্ষ হতে পারে? 'যতমত ততপথ' এবং 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর দেশে, 'সেক্যুলারিজম' ও 'সোশ্যালিস্ট' - বড্ড বেমানান, অনেকটা যেন ৪০ ডিগ্রি গরমে রাজ্যের একদা শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের কোট-টাই পরে থাকার মত।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি, বি আর আম্বেদকর এর নেতৃত্বে গণপরিষদ রচিত যে সংবিধান কার্যকরী হয়েছিল, তার প্রস্তাবনায় 'সেক্যুলার' ও 'সোশ্যালিস্ট' শব্দ দুটিই ছিল না। সংবিধানে বর্ণিত ৩৬৮ ধারাকে তোয়াক্কা না করে, শুধুমাত্র আপদকালের অজুহাত দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রীয় সর্বময়তার চরম দিনে, ৪২তম সংবিধান সংশোধন করে এই শব্দ দুটি সংবিধানের প্রস্তাবনায় যোগ করেন। সাম্প্রতিককালে এই বিতর্ক নতুন করে প্রাসঙ্গিক যে, সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে এই শব্দ দুটি বাদ দেওয়া উচিত কি না। ২০২৩ সালে সুপ্রিমকোর্টে পিটিশন দাখিল করে এই দুই শব্দবন্ধের অবলুপ্তি দাবি করা হয়েছে। এর আগে ২০২২ সালে সুব্রহমানিয়াম স্বামীর পিটিশন, তার আগে ২০২০ সালে রাকেশ সিনহা একই দাবিতে সর্বোচ্চ আদালতের দারস্থ হন। যদিও এই প্রতিবাদের একটা কারণ এই যে এই দুই শব্দবন্ধ জাতীয় ইমারজেন্সির ফসল, তা সত্ত্বেও, এই প্রতিবাদের দার্শনিক তথা তাত্ত্বিক দিকটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কে. টি. শাহ, গণপরিষদে এই প্রস্তাব পেশ করেন যে 'সেক্যুলার' ও 'সোশ্যালিস্ট ' শব্দবন্ধ ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংযোজন করা হোক। প্রত্যুত্তরে আম্বেদকর, রাজেন্দ্র প্রসাদ ও নেহরুর নেতৃত্বাধীন গণপরিষদ সচেতন ও সর্বসম্মতভাবে এই প্রস্তাবকে খারিজ করলো। তবে কি আমাদের ধরে নিতে হবে যে তারা জাতীয় স্তরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন এবং ইন্দিরা গান্ধীর সরকারই একমাত্র সচেষ্ট ছিলেন ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায়? তাহলে কি স্বাধীনতার সময় থেকে ভারতবর্ষ একটি 'থিওক্রেটিক' রাষ্ট্র ছিল, অর্থাৎ যে দেশে রিলিজিয়ন রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত? অবশ্যই না। বলার অপেক্ষা রাখেনা, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজনৈতিক অভিসন্ধি চরিতার্থতার কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ। এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি-র গতিবিধি নিয়ে লেখা 'দ্য মিত্রোখিন আর্কাইভ' বইয়ে।

নেহরু ব্যক্তিগতভাবে 'সেক্যুলার' শব্দটি বিরোধ করতেন, কারণ তিনি মনে করতেন যে এটি একটি অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত শব্দ (depressed word)। নিজে সমাজতন্ত্রের বহু বৈশিষ্ট্যর প্রতি আকৃষ্ট হলেও, তিনি বুঝেছিলেন ভারতীয়ত্বের সঙ্গে পশ্চিমি সমাজতন্ত্র খাপ খায় না। তাই শুধু সংবিধানের প্রস্তাবনায় নয়, কংগ্রেসের কোন দলিলেও সমাজতন্ত্র কথাটি ব্যবহার করেননি। উল্লেখ্য, ১৯৫৫ সাল অবধি কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি যে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থার কথা বলেছিলেন তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না। বাবা সাহেবের যুক্তি ছিল, ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ সমস্ত প্রকার ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি সংবিধানের মূল অংশে এবং প্রস্তাবনায় যথেষ্ট বার করা হয়েছে। 'সোশ্যালিস্ট' শব্দটি নিয়ে আম্বেদকরের বিরোধিতা ছিল শানিত। তাঁর মতে, সোশ্যালিস্ট শব্দটির সংবিধানে কোন স্থান নেই কারণ, ভবিষ্যতে রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হবে, সমাজ ও অর্থনীতির কাঠামো কেমন হবে এবং আগে থেকেই সেসকল তাঁদের পক্ষে পূর্বনির্ধারণ করা, গণতন্ত্রের মূল দর্শনের পরিপন্থী। গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র পরস্পর বিরোধী ধারণা।

'সেমিটিক' রিলিজিয়ানগুলো, মূলত ক্রিসচানিটি যখন মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউরোপে ও পরবর্তীতে আমেরিকা যায় এবং ইউরোপীয় জীবনধারার সঙ্গে একাত্ম হতে শুরু করে তখন চার্চ ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব, অর্থাৎ 'স্টেট' এর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। এই ক্ষমতার লড়াইয়ের সমাধান হিসেবেই সেক্যুলারিজমের জন্ম হয়। যার মূল

বক্তব্য ছিল মানুষের 'রিলিজিয়াস' জীবন (যার বেশিরভাগটাই চার্চের তত্ত্বাবধানে বাইবেলীয় ইহজাগতিক নীতি অনুসরণ) নিয়ন্ত্রণ করবে চার্চ এবং মানুষের রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করবে স্টেট। অর্থাৎ মানুষের রাজনৈতিক ও রিলিজিয়াস জীবনের যে বিভাজন তার ব্যবহারিক নামই হলো সেক্যুলারিজম। পরবর্তীতে ম্যাকিয়াভেলি তাঁর সময়ে সেক্যুলারিজমের মূলগত ধারণা পুনঃসংজ্ঞায়িত করেন। ততদিনে মানুষের রাজনৈতিক জীবন আর স্টেটের একচ্ছত্র আধিপত্যের অধীন ছিল না, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ পশ্চিমি জীবনচর্যার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরকম সময়ে, ম্যাকিয়াভেলি রাজনৈতিক জীবনকে ইহজাগতিক এবং রিলিজিয়াস জীবনকে অতিজাগতিক বা অধিবিদ্যাশ্রয়ী হওয়ার কারণে, বিভাজিত করার কথা বলেন। ম্যাকিয়াভেলির ধারণায়, সেক্যুলারিজম হল একটি ইহজাগতিক চিন্তাপ্রণালী যার নির্মাণে তিনি 'মর্যালিটি'-র ধারণাকে বাদ দিলেন কারণ তার উৎস, অন্ততঃ পশ্চিমে, রিলিজিয়ন। সেক্যুলারিজম হয়ে দাঁড়ালো এক কঠিন, কঠোর ক্ষমতাকেন্দ্রিক পেশীসুলভ বাস্তববাদ যার ভিত্তি ছিল বস্তুবাদ। পশ্চিমি সমাজের বস্তুবাদের বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে এই সেক্যুলারিজমের ধারণা খুব সহজভাবে মিশে যেতে পেরেছিল। যার অর্থ দাঁড়ালো যা- ই ইহজাগতিক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা-ই বস্তুবাদী এবং তাই সেক্যুলার।

মোটের উপর এই ধারণাকে সামনে রেখেই রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্রমক্ষমতায়নের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমি সমাজে সেক্যুলারিজমের ধারণা সর্বজনগ্রাহ্য হয়। এই রাষ্ট্রগুলির কোনোটিই সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘুর রিলিজিয়ান চর্চার অধিকার কেড়ে নেয় না আবার চাপিয়েও দেয় না, প্রকৃতপক্ষে রিলিজিয়ন যেখানে ব্যক্তিগত পছন্দ মাত্র, সেখানে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুর রিলিজিয়ন ভিত্তিক বিভাজনটাই অবাস্তব। পশ্চিমি ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপ্রতীপে গিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সেক্যুলারিজমকে বামপন্থী কায়দায় সংজ্ঞায়িত করেছে। সেক্যুলারিজমের নামে মানুষ ধর্মচর্চার অধিকার হারিয়েছে। তিব্বতের প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্রগুলো পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে, চীনের দাও বা কনফুসীয় মতবাদগুলোও বামপন্থার রোষে পড়েছে। তবে এ বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন তাদের সাম্যের নীতি বজায় রেখেছে। উইঘুর প্রদেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ওপর অত্যাচার অনেকেরই জানা। শুধুমাত্র নাম 'মহম্মদ' হওয়ার 'অপরাধে' ৭ বছরের শিশুকে চীনে গ্রেপ্তার হতে হয়। ভারতবর্ষে সেক্যুলারিজমের চরিত্র পশ্চিম বা চীনের থেকে আলাদা। খাতায়-কলমে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের থেকে রাষ্ট্রের সমদূরত্বের কথা বলা সেক্যুলারিজম অধিকাংশ সময়ই হিন্দুদের থেকে দূরত্ব এবং সংখ্যালঘুদের সঙ্গে নৈকট্য পালন করেছে। এই নীতি অনুসরণ করেই ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং বলেছিলেন ভারতের সম্পদের উপর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সর্বাগ্রে। যে দেশ সত্যি সত্যি সেক্যুলার হবে তার চোখে ব্যক্তির সাম্প্রদায়িকসত্ত্বা অমূলক হওয়ার কথা। কাজেই সেই ভিত্তিতে সংখ্যালঘু বা গুরু বিচার করার প্রশ্নই ওঠে না।

এবার আসা যাক মূল প্রসঙ্গে, যে কেন ভারতবর্ষীয় সমাজে এবং সংবিধানে 'সেক্যুলারিজম' ও 'সোশ্যালিস্ট' শব্দ দুটি বেমানান। আরো ভয়ঙ্কর হলো, সেক্যুলারিজমকে 'সর্বধর্ম সমা ভব'-র সনাতনী ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার রাজনীতি। আগেই বলেছি সেক্যুলারিজম একটি পশ্চিমি ধারণা এবং পশ্চিমি সমাজের দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রধানত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ভোগবাদী, বাইনারি, নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুবাদী সমাজের ভিত্তি হলো পশ্চিমি সেক্যুলারিজম। এগুলো ভালো কি মন্দ সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ, তবে এগুলো ভারতবর্ষের জীবনদর্শন নয়। ভারতবর্ষ দ্বৈত-অদ্বৈত, বস্তুবাদ-ভাববাদ, নরম-চরম, আশাবাদ-নৈরাশ্যবাদ; এই সমস্ত কিছুর বিবাদ এবং সমন্বয় অনুসন্ধানের দেশ। আস্তিক-নাস্তিক, নর-কিন্নর-বানর, গৌর-কৃষ্ণ, প্রত্যেকের দেশ ভারতবর্ষ। তবে, এই আপাত বৈপরীত্যের অনেক উর্ধ্বে গিয়ে ভারতভূমি ধর্মের দেশ, একটি ধর্ম-সাপেক্ষ দেশ। এই ধর্মের ভিত্তি অটল কর্তব্যবোধ, আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে মুক্তির সংকল্প, এবং ব্রহ্মলাভ। ধর্মের অস্তিত্ব কে অস্বীকার করে ভারতীয় সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা অসম্ভব। আর সেই ভারতবর্ষকেই ধর্মের বিষয়ে নিরপেক্ষ করে তোলার ষড়যন্ত্র 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। যে সমাজ থেকে ধর্মকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয় সেই সমাজ ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে থাকা রাষ্ট্রব্যবস্থা কি করে ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হতে পারে বা ধর্মের বিষয়ে তারা কি করে নিরপেক্ষ হতে পারে? ভারতের সনাতন ধর্ম এবং তার থেকে জন্ম নেওয়া সহস্রধারা বারবার প্রমাণ করে দিয়েছে যে 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-র যে আপ্তবাক্য কে সামনে রেখে আমরা পৃথিবীর জন্য নিজের দ্বার খুলে দিয়েছিলাম, তার ভিত্তি ছিল 'সর্বধর্ম সমাভব', 'সেক্যুলারিজম' নয়। তাই সেক্যুলারিজমের ভারতীয় তর্জমা ধর্মনিরপেক্ষতা করে কংগ্রেস ও তার সহকারীরা সমাজকে ধর্মের থেকে নিরপেক্ষ হতে উৎসাহ দিয়েছে। যার ভারতীয় অনুবাদ হতে পারতো 'পন্থ- নিরপেক্ষতা' তা না করে কার স্বার্থ চরিতার্থ করা হয়েছে? সেক্যুলারিজমের নামে ধর্মবোধ কে ভুলিয়ে দেওয়া এবং সেমিটিক রিলিজিয়ান এর ধারণার সঙ্গে ভারতের ধর্মকে গুলিয়ে দেওয়ার যে অপচেষ্টা ব্রিটিশরা তাদের প্রশাসনিক স্বার্থে শুরু করেছিল, বর্তমান প্রেক্ষিতে সেই 'পলিটিক্যাল কারেক্টনেস' র ধারক ও বাহক হয়েছে বামপন্থী ও ইসলামিস্টরা। প্রকৃতপক্ষে সেকুলারিজমের কোন ভারতীয় অনুবাদ হওয়া সম্ভব নয়। ভারতকে যারা ধর্ম নিরপেক্ষ করার কথা বলেন তারা আসলে ধর্ম ও নিরপেক্ষতা-র কোনটাই বোঝেন না।

সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেজনেভ এবং ইন্দিরা গান্ধী।

ওরা ভয় পেয়েছে

জয়ন্ত গুহ

তৃণমূল বা সিপিএম - উভয় ক্ষেত্রেই আসলে আক্রমণের লক্ষ্য রাজ্যের সাধারণ মানুষের সমস্যার পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিবাদ এবং দলমত নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অসংখ্য জনমুখী প্রকল্প। আসলে ওরা ভয় পেয়েছে। তৃণমূলের ক্ষমতা হারানোর ভয় এবং সিপিএম নেতৃত্বের প্রচারের আলো থেকে সরে যাওয়ার ভয়।

রাজনীতি এবং রাজনীতিকে কেন্দ্র করে সেনসেশন তৈরি হওয়া দুটো আলাদা বিষয়। রাজনৈতিক সেনসেশনই যখন বড় হয়ে ওঠে বা সেটাকেই বড় করে দেখানোর চেষ্টা হয় তখন আসলে রাজনীতির খবর ধামাচাপা পড়ে। গৌণ হয়ে যায় রাজনীতি। রাজার মত মহান যে নীতি সেটাই রাজনীতি। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বা টেলিভিশন সিরিয়াল বা ওটিটি সিরিজের সেনসেশন আর রাজনীতি এক নয়। কিন্তু অদ্ভুতভাবে ক্ষমতাহীন হয়েও রাজ্যে সিপিএম সেই রাজনীতির সেনসেশন তৈরি করছে। বলা ভাল সংগঠিত ভাবে নির্মাণ করছে। ওদের রাজনীতির কথা মানুষ আর শোনেনা। সুতরাং রাজনীতির সেনসেশন তৈরি করে পালে হাওয়া কাড়ার চেষ্টা করা ছাড়া সিপিএমের গতি নেই। খুব ভাল করে খেয়াল করলে দেখা যাবে, ওদের এবং প্রশান্ত কিশোরের সংস্থার সহযোগিতায় নব্য তৃণমূলের রাজনৈতিক সেনসেশন তৈরি বা নির্মাণে কোন ফারাক নেই। উভয় ক্ষেত্রেই আসলে আক্রমণের লক্ষ্য রাজ্যের সাধারণ মানুষের সমস্যার পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিবাদ এবং দলমত নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অসংখ্য জনমুখী প্রকল্প। আসলে ওরা ভয় পেয়েছে। তৃণমূলের ক্ষমতা হারানোর ভয় এবং সিপিএম নেতৃত্বের প্রচারের আলো থেকে সরে যাওয়ার ভয়।

গরীব-মধ্যবিত্তের মোদী সরকার।

গত দুবছরে সিপিএমের মূল রাজনৈতিক এজেন্ডা কী? প্রথমত নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিষেক বাবু ধরা পড়িল না পড়িল না। ধরিতে হইবে এবং খুব দ্রুত ধরিতে হইবে। ভাবখানা এমন যে ধরিলেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার সমাধান হইবে এবং সেই পথ তাহারাই তৈরি করিল। দ্বিতীয় এজেন্ডা, নিয়োগ দুর্নীতিতে রাঘববোয়াল ধরা পড়িতেছে না কারণ দিদি-মোদী সেটিং। এর মধ্যে কোনোটাই রাজ্যের উন্নয়ন বা সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের স্বার্থের পাশে মাটিতে দাঁড়িয়ে রাজনীতি বা রাজনৈতিক প্রতিবাদ নয়। এতে সাধারণ মানুষের কোন স্বার্থ নেই। এসবই সিপিএম নেতৃত্বের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজস্ব স্বার্থ। ওদের সাধারণ কর্মী-সমর্থকরাও রাজ্য সিপিএমের এসব 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' তত্ত্বে বিশ্বাস করে কিনা

রাজ্য বিজেপির দুই লড়াকু নেতা।

সন্দেহ! আরে বাবা সিকিম থেকে নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসে যখন সংকটে উত্তরবঙ্গ, নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় যখন বিপদের মুখে সুন্দরবন, সেচের জল না পাওয়ায় যখন ধুঁকছে বর্ধমানের চাষিরা, চাকরির পরীক্ষা দিয়েও কারচুপির ফাঁকে যখন চাকরি প্রার্থীরা এবং ডিএ আন্দোলনের কর্মীরা দিনের পর দিন রাস্তায় বসে আছে তখন তাঁদের পাশে ধুলোমাটিতে না থেকে সিপিএম রাজ্য নেতৃত্ব চ্যানেলে চ্যানেলে সরবে শত রূপে বিকশিত হতে ব্যস্ত! নিয়োগ দুর্নীতিতে কে গ্রেফতার হবে, কখন হবে, কিভাবে হবে সেটা নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডি-সিবিআই-এর তদন্তের ওপর এবং সেই তদন্ত আদালতের পর্যবেক্ষণে হচ্ছে। যা নিয়ে আস্থা রাখতে হবে আদালতের ওপরেই। অন্যথায় বিমানবাবুর 'লালা তুই বাংলা ছেড়ে পালা' তত্ত্বে গেলে, আদালতের ওপর আস্থা হারালে নৈরাজ্য তৈরি হবে রাজ্যে। আর সেটা হলে সুবিধা হবে নৈরাজ্য তৈরি করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল যাদের রাজনীতির অন্যতম অস্ত্র। আমরা নিশ্চয়ই চাইবো না, ১ পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ট্রাম জ্বালানো বা সাইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের মত আবারও রাজনীতির গনগনে সেনসেশনকে ফিরিয়ে আনতে। চেষ্টা করেও সেই অবস্থা আর ফিরিয়ে আনতে পারবেনা বুঝেই কি প্রচারের আলোয় অন্তত টিকে থাকতে সিপিএম অনুসরণ করছে তৃণমূলের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং চ্যানেল নির্ভর রাজনীতি? যে রাজনীতিতে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু গন্ধ আছে। অনেকটা গন্ধরাজ লেবুর মত, রস নেই কিন্তু গন্ধেই রাজা। বাংলার রাজনীতিতে এই 'গন্ধরাজ সিপিএম'-এর আসলে তৃণমূলের সঙ্গে কোন বিরোধিতা নেই, স্বার্থের বিরোধিতা ছাড়া। চ্যানেলে চ্যানেলে গন্ধরাজদের সরকার বিরোধিতার গন্ধ ছড়ানো এবং ডাক পড়লেই নবান্নে গিয়ে কাটলেট খাওয়া। মাঝেসাঝে রাস্তায় নেমে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নির্ভর তৃণমূল বিরোধী গন্ধ ছড়িয়েই আবার ঢুকে যাওয়া ঠান্ডা ঘরে। কেননা এককাট্টা তৃণমূল বিরোধিতা করে বিজেপির সঙ্গে একই রাজনৈতিক লাইনে আসতে চায়না সিপিএম। এলে সিপিএম থেকে আরও কর্মী-সমর্থক-ভোট সব চলে যাবে বিজেপিতে। এটা কলকাতা কেন্দ্রিক সিপিএম নেতৃত্বের ভয়। জেলায় জেলায় সিপিএম-তৃণমূল হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে গেলেও সিপিএম রাজ্য নেতৃত্ব চায়, বিজেপির 'ভোট কাটুয়া' হয়ে তৃণমূলের সুবিধা করে দিয়ে তৃণমূলের বিরোধিতায় ১ নম্বরে আসতে। এই কারণেই গন্ধরাজ বাবুদের কাটলেট প্রেম এবং মোদী-দিদি সেটিং তত্ত্বের জোরালো প্রচার। সেটিং তত্ত্ব নিয়ে, সাদা মনে কাদা নেই, আমার নিছকই এক অবান্তর প্রশ্ন - জরুরি অবস্থার সময় দেশ জুড়ে সামনের সারিতে থাকা প্রায় সব নেতা গ্রেফতার হলেও জ্যোতি বসু কেন গ্রেফতার হননি! সেটিং নয়তো! কোথায় ছিলেন তিনি? সেকথা কি জানতেন ইন্দিরা গান্ধী। জানতেন ইন্দিরা ও জ্যোতি বসুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রয়াত সিপিআই সাংসদ ভূপেশ গুপ্ত? সিপিএম যদি গন্ধরাজ হয় তবে অভিষেক বাবুর নেতৃত্বে নব্য তৃণমূল কচলে কচলে তেঁতো করে দেওয়া লেবু। সেই একই 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার'-এর ঘ্যানঘ্যানানি। বঞ্চনা কচলে কচলে আর কতদিন! একশো দিনের কাজে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে দিল্লিতে চলে গেল সবাই মিলে। দিতেই হবে টাকা। এ যেন দল বেঁধে রথের মেলায় গিয়ে জিলিপি খাওয়ার বায়না! সেখানে গিয়ে আবার ধর্নায় বসে পড়ল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দফতরে। কেন? কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে নাকি কথা বলতে হবে বঞ্চিত মানুষের সঙ্গে। নেতারা কথা বলবে না! কলকাতায় এলেন মন্ত্রী কিন্তু তখন মাচা বেঁধে রাজভবনের সংরক্ষিত এলাকায় চলছে তুমুল খিস্তি। যদিও রাজ্যে একশো দিনের কাজে '২৫ লাখ ভুয়ো শ্রমিক'-এর টাকাটা কি চিলে নিয়ে উড়ে গেল নাকি গাধায় চিবিয়ে খেল তা নিয়ে কোন সদুত্তর নেই। আরে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা নিয়ে কোন সরকারী নিয়মকানুনের বালাই নেই নাকি! আসলে তৃণমূল ভয় পেয়েছে। আদালতের মোচড় এবং বিজেপির ভয়ানক রাজনৈতিক আক্রমণে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে। শুভেন্দু-সুকান্তের নেতৃত্বে বিজেপির সাঁড়াশি আক্রমণে বিপর্যস্ত তৃণমূল। শাসকের আসনে থেকেও রাস্তা ছেড়ে ধর্না মঞ্চে বঞ্চনার লেবু কচলানো ছাড়া এখন আর কোন পথ খোলা নেই তৃণমূলের। চেকমেট এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ফেক নিউজ

তৃণমূলের কীর্তি আজাদের 'কীর্তি'। বিজেপি কর্মীদের নিয়ে মজা করতে গিয়ে হাসির খোরাক কীর্তি। কানাড়া ব্যাংকের একটি শাখায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীদের একটি পুরনো ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কীর্তিবাবু বললেন বিজেপি নাকি কানাডাকে কানাড়া ব্যাংক ভেবে বসেছে।

বিখ্যাত সংবাদপত্র ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এবং ভারতের অন্যান্য সমস্ত মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর - চীনের মহাকাশ অভিযানের প্রধান বলছেন ভারত নাকি তাদের দক্ষিণ মেরুতে আদৌ নামেনি।

চিনা বিজ্ঞানীদের দাবি এবং সরকার পরিচালিত তাদের মিডিয়ায় ভারত বিরোধী এই ফেক প্রোপাগান্ডা আজকের নেটদুনিয়ায় চূড়ান্ত হাস্যকর।

ভারতের খালিস্থান বিরোধী অবস্থানকে শিখ বিরোধী কার্যকলাপ হিসাবে দেখাতে কিছু দেশ বিরোধী মানুষ, দেশ জুড়ে প্রচার করে যে ভারতীয় বায়ুসেনার শিখ পাইলটরা নাকি কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করেছে। রাষ্ট্রবাদী ভারতীয়দের ভাবনাকে ছোট প্রমাণ করতেই ছড়ানো হয় এই ধরনের ফেক নিউজ।

স্বঘোষিত লিবারেল বুদ্ধিজীবী অরুন্ধতী রায় এক ভিডিও বার্তায় বলছেন, গুজরাটের কিছু হিন্দু নাকি অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে ফিরছিল এবং তখন কিছু অজ্ঞাতপরিচয় যুবক সেই ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দেয়। বাস্তব ঘটনা হলো গুজরাটের গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন দিয়ে নিরীহ হিন্দু করসেবকদের হত্যা করেছিল করা হয়েছিল ২০০২ সালে, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রায় দশ বছর পর।

খবর ছিল পাঞ্জাবি শিখরা নাকি ভারতের অমৃতসরে রিসার্চ এন্ড অ্যানালিটিক উইং-এর (র) বাইরে প্রতিবাদ করছে ব্যাপক সংখ্যায়। খবর ছড়িয়ে যায় ঝড়ের মত। পরে জানা যায় পাকিস্তানের টাকায় চলা অল্প কিছু খালিস্তানি জঙ্গী প্রতিবাদ জানিয়েছিল আসলে কানাডার এক অফিসের বাইরে। মজার কথা হল এই খবর ছড়ানো ব্যক্তি পাকিস্তানের নাগরিক।

ভারতের বিখ্যাত দৈনিক 'দ্য হিন্দু' বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণ করে জানাচ্ছে যে ভারতে সবথেকে বেশি ফেক নিউজ ছড়ানো হয় পশ্চিমবঙ্গে।

নিশ্চিত করে বলা যায় রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সব ফেক নিউজের কান্ডারী হল তৃণমূল আর তার দোসর বামেরা।

দিল্লির বিজয়াঘাটে শ্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিবসে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ।

দিল্লির রাজঘাটে গান্ধীজির জন্মদিবসে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ।

বিহারের পাটনায় শ্রদ্ধেয় নেতা কৈলাশপতি মিশ্রের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।

মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয় ও সহকার ভারতী আয়োজিত 'লক্ষ্মণরাও ইনামদার স্মৃতি বক্তৃতা' অনুষ্ঠানে শ্রী অমিত শাহ।

ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশন সেল, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের ডাকে শিলিগুড়িতে 'চা শ্রমিক সমাবেশ'-এ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।

মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলায় 'লোকসভা প্রবাস যোজনা' কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

রাজ্যবাসীকে শুভ শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক টী.সি. দত্ত মার্চেন্টস প্রা.লি., কলকাতা - ৭০০ ০২৫ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।